আমাদের প্রতীয়মান হইবে, আবার পূর্ণ মাত্রায় আমরা তাহা স্বকার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিব। এসম্বন্ধে যাহা কিছু হইতেছে—আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, তাহাতে আমরা যে ঠিক পথে আসিয়াছি, প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পারিয়াছি, তাহা এখনও বলিতে পারা যায় না, কিন্তু রকম সকম ভাব গতিক যে খুব ভাল, অতি আশাপ্রদ তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্য আমাদের সুখেরও ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু এবিষয়ে একটা কথা বক্তব্য এই যে হিন্দুধর্ম্ম এবং শাস্ত্রাদি যদিও আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল ভিত্তি ভূমি, তথাপি কেবলমাত্র তাহা ধরিয়া থাকিলেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অবাধিত ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। আমাদের চেষ্টা এবং কার্য্য এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে দেশ কাল এবং পাত্রোচিত হওয়া চাহি। ভারতবর্ষ যদি এখন বেদব্যাস পরাশর জাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রকীর্ত্তিত ভারতবর্ষ থাকিত, তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহাদিগের অনুমতে চলিলেই আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারিত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, এখন কালের বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতা এক প্রকার প্রকৃতির ছিল, এখন পৃথিবীতে দিন দিন অন্য এক প্রকৃতির সভ্যতার আধিপত্য বিস্তার হইতেছে। যে দেশ নূতন, অসভ্য, যাহার পুরাতন কিছু নাই, সে দেশের পক্ষে এই নূতন সভ্যতা পরিপূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নহে, আমাদের পুরাতন অনেক জিনিষ আছে, আমরা একটা পুরাতন উৎকৃষ্ট সভ্যতার অধিকারী; সুতরাং আমরা এই নূতন সভ্যতা একেবারে গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু পক্ষান্তরে, যখন ঈশ্বরের কার্য্যকৌশলে এবং অভিপ্রায়ে আমরা এই নূতন সভ্যতার আয়ত্বমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন ইহার প্রভাব একেবারে অগ্রাহ্য করাও আমাদের সাধ্যাতীত। এমন অবস্থায়, পুরাতন এবং নূতন উভয় সভ্যতার সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া একটী মধ্যপথ অবলম্বন করাই এক্ষণে আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। যাহা পুরাতন, যাহা যুগযুগান্তর হইতে আছে, তাহা অবশ্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে অনেক বিষয়ে আমাদিগকে নূতন হইতেও উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ বালানুপযোগীতা দোষে আমাদের চেষ্টা সর্ব্ববিষয়ে সুফলপ্রদ হইবে না।

রাজনীতির আলোচনা নূতন সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ। ইহা বর্ত্তমান কালীয় সকল সমাজেরই উন্নতির জন্য অতীব আবশ্যকীয়। আমাদের পক্ষে ইহা আবার দ্বিগুণতর আবশ্যকীয়, তাহার কারণ এই যে আমরা বৈদেশীক শাসনাধীন। রাজা রাজত্বের অনেক কথা বুঝেন না, অনেক কথা শুনেন না, অনেক কথা আবার স্বার্থান্ধ হইয়া উড়াইয়া দেন, এমন অবস্থায় তাঁহার রাজনীতি—তাঁহার কার্য্যকলাপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা যথেষ্টরূপে আলোচনা করিব, সর্ব্ববিষয়ে আন্দোলন উত্থাপন করিব, ততক্ষণ আমাদের সর্ব্ববিষয়ীক অভাব, ইচ্ছা কিম্বা স্বার্থ কিছুতেই দূরীভূত, পরিতৃপ্ত এবং সিদ্ধ হইতে পারিবে না। অতএব রাজনীতির সম্যক্ আলো-

চনা যে আজকাল আমাদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সে আলোচনা রীতিমত প্রকারে আজ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের অদ্যকার সমালোচ্য উচ্চশ্রেণীর কয়েকখানি সাময়িক পত্রই তাহার প্রধান প্রমাণ। ৯ খানি পত্রিকার মধ্যে ৭৩টী প্রবন্ধ, তন্মধ্যে প্রকৃত রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কেবল একটীমাত্র। অনেকে বলিতে পারেন যে 'সে কি কথা? রাজনীতির আলোচনা আমাদের মধ্যে নাই? এক রাজনৈতিক আলোচনায় এবং আন্দোলনে—সম্বাদ পত্রের লেখালিখি, বঙ্গীয় যুবকের বকাবকি, গবর্ণমেণ্টের ঠকাঠকিতে—আমরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতেও বলিবে রাজনীতির আলোচনা নাই?' আমরা উত্তরে বলিব—'বাস্তবিকই নাই, যাহা এবং যেরূপ হওয়া উচিত তাহার কিছুই এখনও হয় নাই।' আমরা বলি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উষ্ণ মস্তিষ্ক পঠদ্দশাগ্রস্থ যুবকবৃন্দের পরিবর্ত্তে দেশের মধ্যে যাহারা প্রবীন, বিজ্ঞ, বয়স্থ, ধীর প্রকৃতি, চিন্তাশীল,—অর্থাৎ প্রধানতঃ যেরূপ শ্রেণীস্থ লোকেরা সাময়িক পত্রে লিখিয়া থাকেন—তাঁহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সহিত রাজনীতির আলোচনা না করিবেন, ততক্ষণ সে আলোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভই হইবে না। আমাদের যুবকবৃন্দের উদ্যম, উচ্ছ্বাস, বাচালতা, যাহাই বল, তাহাকে আমরা নিন্দা করি না; কারণ তাঁহারা এক্ষণে বালক, তাঁহাদের চরিত্র গঠনের জন্য ও সময় আবশ্যক; এখন এইরূপ করিয়াই তাঁহারা প্রস্তুত হইবেন—পরে তাঁহারাই দেশের বিজ্ঞ, প্রবীন, চিন্তাশীল লোক হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের এই উদ্যমের সহিত যদি তাঁহাদের বয়োবৃদ্ধেরা আপনাদিগের বয়োচিত কর্ত্তব্য পালন না করেন, তাহা হইলে রাজনীতি আলোচনার যে আসল সুফল তাহা আমরা কখনই প্রাপ্ত হইব না। বিলাতে কিম্বা আজকালকার দিনে সকল সভ্যদেশেই এইরূপ লোকেরাই রাজনীতির আলোচনা করেন, সম্বাদপত্র এবং বিশেষতঃ সাময়িক পত্রই তাঁহাদের অভিপ্রায় এবং মতামত ব্যক্ত করিবার প্রধান রঙ্গভূমি, কোন প্রয়োজনীয় কথা কিম্বা বিষয় উঠিলেই তাঁহারা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন এবং বাদ প্রতিবাদ দ্বারা তাহা বিধিমত প্রকারে আলোচনা করেন, সেই বাদ প্রতিবাদের ফলে সাধারণ মত গঠিত হয় এবং সেই সাধারণ মতের দ্বারাই অভিপ্সিত সকল প্রকার কার্য্য অনুষ্ঠান হয়। বিলাতে এমন মাস যায় না যে, প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন কিম্বা তাঁহারই শ্রেণীস্থ বড় বড় লোকেরা সাময়িকপত্রে এক আধটি করিয়া প্রবন্ধ না লিখেন। অবশ্য এরূপ অবস্থা, দেশের বড় লোকদিগের মধ্যে এরূপ যত্ন এবং আগ্রহাতিশয়, আমাদের দেশে এখনই আমরা প্রত্যাশা করি না; কিন্তু তাই বলিয়া যে একেবারে কিছুই হইবে না, তাহারও কোন অর্থ নাই। দেশের উন্নতি করিব—ইহাই যখন আমাদের ইচ্ছা, আমাদের আজকালকার প্রধান জাতীয় অভিলাষ, তখন আসল যে উপায়, প্রকৃত যে পথ তাহা অবলম্বন না করিলে চলিবে কেন?

ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান শিল্প এবং বাণিজ্যের সমধিক আলোচনা ও আজকাল

আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সমালোচ্য কয়েকখানি পত্রিকা মধ্যে আমরা ৫টিমাত্র উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রবন্ধ দেখিয়াছি। ভারতীতে 'সেন রাজগণ,' বান্ধবে 'প্রাচীন ভারত' এবং 'সম্বন্ধ নির্ণয়,' নব্য ভারতে 'প্রাচীন আর্য্যসমাজ,' এবং প্রবাহে 'ভারতীয় রাজকুলদর্পণ।' আমরা ইচ্ছা করি এইরূপ প্রবন্ধাদি আমাদের সাময়িক পত্রগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

জীবনচরিতের মধ্যে ভারতীতে 'রামমোহন রায়' নামক প্রবন্ধটি অতি উত্তম। ইহা যদিও রামমোহন রায়ের প্রকৃত জীবনী নহে, উক্ত মহাত্মা স্বদেশের জন্য কি প্রকার প্রকৃতির কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাই ইহাতে অতি উত্তমরূপ আলোচিত হইয়াছে। আমাদের অনুরোধ, পাঠকবর্গ এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

প্রবাহে এই প্রবন্ধটির আবার একটি সমালোচনা প্রকাশ হইয়াছে। সমালোচনা এবং প্রতিবাদ অতি উত্তম জিনিষ, ইহা দ্বারা সমাজের অনেক উপকারের সম্ভাবনা; কিন্তু প্রতিবাদকারীর হৃদয়ে সদভিপ্রায় এবং সুরুচির অভাব হইলে ফল বিপরীত হয়। প্রবাহের লেখকের এই প্রতিবাদ করিবার অভিপ্রায় কি তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; বোধ হয় যেন কেবলমাত্র প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিন্দা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায়কে ধর্ম্মসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুদার মতাবলম্বী বলিয়াছেন। আমরা 'রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রবন্ধটি খুব ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছি, তাহাতে তিনি যে কোথায় রামমোহন রায়কে অনুদার মতাবলম্বী বলিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলাম না। তবে দেখা যাইতেছে যে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার প্রতিবাদকারী মহেন্দ্রবাবুর মধ্যে 'উদারতা' সম্বন্ধে মত বিভেদ আছে। মহেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে রামমোহন রায় উদারতার সাগর ছিলেন; হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান বৌদ্ধ সকলেরই ধর্ম্ম তাঁহার নিকট সমান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি কিছুমাত্র তারতম্য করিতেন না। আর রবীন্দ্র নাথ বলিতেছেন যে রামমোহন রায় উদার ছিলেন বটে, জগতের কোন ধর্ম্ম কিম্বা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপরই তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিলনা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন নাই। তিনি ভারতবর্ষে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা নূতন ধর্ম্ম নহে, আর্য্য ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত সেই পুরাতন সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম। সমস্ত জগৎ এই সনাতন ধর্ম্ম অধিকার করিয়া সুখী হয় ইহাই তাঁহার মনের অভিলাষ ছিল এবং সেই জন্যই স্বদেশে, সেই ধর্ম্মের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে, তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কথার মধ্যে অনুদারতা কোথায় তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। বরঞ্চ মহেন্দ্রবাবুর অভিলষিত উদারতার অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত উদারতাকেই আমরা প্রাণের সহিত অনুমোদন করি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে 'আমি নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি বলিয়া কি সকলে বলিবে আমি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ পরের সহিত স্বতন্ত্র হইতেছি? স্বগৃহ না থাকিলে আমি পরকে আশ্রয় দিব কি করিয়া? রামমোহন রায়

সেই স্বগৃহ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন।' আমরাও বলি, ঠিক কথাইত। 'উদারতা' একটা খুব উচ্চদরের কথা, কিন্তু আপনার ধুলি গুঁড়ি অথবা মণিমাণিক্য যাহাই থাকুক তাহাকে সাব্যস্ত করিয়া, তাহাকে 'স্থিতু' করিয়া যে ব্যক্তি হৃদয়মধ্যে 'বসুধৈব কুটুম্বকং' এই ভাবের অবতারণা করিতে পারে সেই পৃথিবীমধ্যে প্রধান কৃতী ব্যক্তি। আর তাহা না হইয়া আপনার যথা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে পরের যথা সর্ব্বস্বকেই আপনার ভাবিয়া উদ্দেশ্য এবং স্বত্ব বিহীন হইয়া সমস্ত চরাচরমধ্যে ঘূর্ণাবায়ু পতিত শুষ্ক বৃক্ষ পত্রবৎ যথেচ্ছা ক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে সে পৃথিবীতে কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হয় না। মহেন্দ্রবাবু বুঝিবেন যে এইরূপ অযথা উদারতা অবলম্বন করিয়াই আমাদের বাঙ্গালীজাতি —সমগ্র ভারতবাসীরাই আজকাল সর্ব্ববিষয়ে এরূপ অনিশ্চিত শোষনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আপনার ধর্ম্ম নাই, আপনার বিশ্বাস নাই; আপনার আচার ব্যবহার নাই, আপনার রীতিনীতি নাই; পরের সমস্তই যেন আমার নিজের, অথচ যে পরের কাছে আত্মীয়ভাবে অগ্রসর হই, সে অগ্রসর হইতে দেয় না, সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লওয়া ত দূরের কথা। আপনার যাহা যাহা আছে তাহা মজবুত কর; সেও ত মন্দ জিনিষ নহে; পরকে তাহা দিওনা তাওত তাহাতে বলে না; তবে আর অনুদার হইলে কিসে? আমরা বিশ্বাস করি, রামমোহন রায় ঠিক এইরূপই করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহেন্দ্র বাবুর এই প্রতিবাদ যে কেবল শিষ্ট প্রতিবাদ তাহা নহে, ইহা নিন্দাবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটা কোন প্রয়োজনীয় কথা লইয়া আপনাপন অভিমত ব্যক্ত করিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু মহেন্দ্র বাবু সুধু তাহা করেন নাই - তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যক্তিগত শ্লেষ এবং গ্লানি করিয়াছেন। প্রথম নম্বরে দেখাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ আপন প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের অনেক ভাব চুরি করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই চুরি আবার উভয় লেখকের লেখা হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত এবং তুলনা করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ভাব এবং সত্য নূতন হইতে পারে না; একজনের মনে যাহা উদিত হইয়াছে, আর একজনের মনেও তাহা উদিত হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া যদি সব লেখককেই চোর বলা যায় তাহা হইলে ত লেখা কার্য্যটা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হয়।

দ্বিতীয় নম্বরে মহেন্দ্র বাবু রবীন্দ্রনাথের রচনার দোষ—ব্যাকরণাশুদ্ধি, অপকৃষ্ট শব্দাদির ব্যবহার ইত্যাদি দোষ দেখাইয়াছেন। স্বীকার করিলাম মহেন্দ্র বাবু একজন অতি যোগ্য, সুচতুর, এবং সাবধান লেখক; সকল লেখকেরই তাঁহার মত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু সে যাহা হউক, একটা উচ্চ বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া এরূপ ব্যক্তিগত নিন্দা করা তাঁহার পক্ষে অতি কুরুচির পরিচায়ক। আমরা বাস্তবিক মহেন্দ্র বাবুর এরূপ অযথা আচরণ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। প্রবাহ সম্পাদক মহাশয়কেও বলি, এরূপ ব্যক্তিগত ইর্ষাপূর্ণ প্রতিবাদ তাঁহার পত্রিকায় স্থান দান করা ভালহয় নাই।

শিল্প বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এক রামধনু ভিন্ন অপর কোন

পত্রিকাতেই নাই। রামধনুর প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু যাহা হউক এ পত্রিকায় সাধারণ শিক্ষোপযোগী অনেক বিষয় থাকে। এই পত্রিকা ভাল করিয়া চালিত হইলে এতদ্দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

নবজীবন পত্রিকার উৎকৃষ্টতা এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন মত বিভেদ নাই; কিন্তু এবারকার পত্রিকায় রাজনীতি, ইতিহাস, কিম্বা জীবনচরিত ইত্যাদি বিষয়ের একটিও প্রবন্ধ নাই। যেরূপ যোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা এই পত্রিকা লিখিত এবং সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা হইতে আমরা দেশের অনেক উপকার প্রত্যাশা করি।

এবারকার নব্যভারত, ভারতী এবং বান্ধব, বেশ হইয়াছে। প্রত্যেকেই অনেকগুলি করিয়া প্রবন্ধ আছে এবং সে প্রবন্ধ সমস্তে বিষয়েরও বেশ বৈচিত্র আছে।

আর্য্যদর্শন পত্রিকায় 'ভগবদ্গীতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আজকাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবদ্গীতা গ্রন্থের যে যথেষ্ট সম্মান হইয়াছে এবং সকলেই তল্লিখিত মত এবং উপদেশাদি সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তজ্জন্য লেখক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সেই ভগবদ্গীতা যে নিতান্ত অপদার্থ এবং অসঙ্গত মত পূর্ণ গ্রন্থ এবং আমাদের অগ্রহণীয় তাহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাব মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, পরে কতদূর কি লেখেন না দেখিয়া আমরা এখন বিশেষ কিছু বলিতে পারিনা। তবে উপস্থিত এই, পর্য্যন্ত বোধ হইতেছে যে লেখক যেরূপ তীব্রভাবে এবং রোকের সহিত লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হস্তে হিন্দুমাত্রেরই অতীব শ্রদ্ধার জিনিষ ভগবদ্গীতা এবং সেই ভগবদ্গীতার নায়ক সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়েরই পরিত্রাণ নাই। লেখক বলিয়াছেন—'কিন্তু সেই ত্রিভঙ্গমুরারি, যাঁহার মন বাঁকা, হৃদয় বাঁকা, অঙ্গভঙ্গি সকলই বাঁকা, সেই বাঁকা ঠাকুরটি এমন পাত্র নন যে কোন সাধু কার্য্যে লিপ্ত হন। তিনি চাতুরিবলে একাই একশ। তিনি আত্মাভিমানে এতই পূর্ণ যে আপনাকে ভগবান বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই ধূর্ত্ত শিরোমণি ঘোর পক্ষপাতী, কুরুকুলের যমদূত শ্রীকৃষ্ণ, এই লেডি ম্যাকবেথের প্রেতাত্মা সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে ঘোর হত্যাকাণ্ডে উত্তেজনা করিতেছেন। * * * সেই কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে, হত্যা করাইবার জন্য যে সকল প্রবোচন বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি সদুপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? অথচ দেখিতে পাই তাহাই কোন কোন লোক সদুপদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন।'

আমরা সমালোচনার্থ অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছি। স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে সমালোচনা হইল না—আগামী বারে হইবে।

PRINTED AND PUBLISHED BY NERODE CHUNDER MOOKERJEE AT THE DURBHUNGA TRADING CO.'S, "UNION PRESS."

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; চৈত্র, প্রথম পক্ষ। [২৩ সংখ্যা।

সিদ্ধান্তবাগীশের টোল।

(৪) পরমেশ্বর স্তুতি নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না।

পরমেশ্বর স্তুতি নিন্দাতে তুষ্ট বা কষ্ট হন না। তাহা হইলে তাঁহাতে ভোগাদি দোষ অর্শে। 'তমোবণ্য পিপ্পলং সাদ্বত্তীতি' কঠবল্লী বচনে তাঁহার ভোগরাহিত্য, সাক্ষিত্ব ও প্রকাশত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ও স্বার্থবিশিষ্ট প্রবৃত্তির অভাববশতঃ তিনি জীবকৃত স্তুতি নিন্দাতে মুগ্ধ হন না। শারীরক সূত্রে (১।২।৮) কহিয়াছেন 'সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ।' জীবের ন্যায় পরমেশ্বরেতে কর্ম্মজন্য সম্ভোগের প্রাপ্তি নাই। এই সূত্রের উপলক্ষে আচার্য্যেরা কহিয়াছেন 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্ম নিরাগদ্বেষয়োর সম্ভবাৎ' ইত্যাদি। যদিও গীতা স্মৃতি (১২ অঃ) অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং' প্রভৃতি বচনে ভক্ত পরমেশ্বরের প্রিয়রূপে বর্ণিত হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে এমত বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহার ভক্ত বা ভক্তি-কারক ব্যক্তিরাই তাঁহার প্রিয় এবং তদ্ভিন্ন জনেরা অপ্রিয়। কেননা ঐ শাস্ত্রের (২ অঃ) মীমাংসা করিয়াছেন 'সমোঽহমিত্যাদি।' এতদুপলক্ষে স্বামী কহিয়াছেন 'যদিতু ভক্তেভ্যএবমোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হিতবাপি কিংরাগ দ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি ?' তজ্জন্য কহিলেন 'সমোঽহমিতি' অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমি সমান। আমার প্রিয় বা দ্বেষ্য কিছু নাই। যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে সে সেই ভক্তির গুণেই আমাতে অনুরক্ত হয়। সুতরাং আমাকে সে তৎপ্রতি অনুগ্রাহক রূপে দর্শন করে। 'মদভক্তেরেবায়ং মহিমেতি' আমার ভক্তিরই এইরূপ মহিমা। ইহা আমার সার্ব্বভৌমিক নিয়ম। যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে তদনুযায়ী ফল পাইবে। ভক্তি স্তুতি উপাসনার শুভ ফল, দ্বেষ নিন্দা নাস্তিকতার অশুভফল তত্তৎ কর্ম্মাধীন। সে সমস্ত কর্ম্ম ও তৎফল প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ। ভগবান কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজস্বরূপিণী প্রকৃতির অতীত। তাঁহাতে বৈষম্য থাকিতে পারে না। কর্ম্মফলভোগের হেতুস্বরূপ কর্তৃত্ব জীবের। প্রকৃতিই সেই কর্তৃত্বে

জননী। সেই কর্ত্তৃত্বই প্রতি জন্মে ক্রিয়মান সুকৃতি দুষ্কৃতির হেতু হয়। সেই কর্ত্তৃত্বে ভগবান নির্লিপ্ত। গীতা স্মৃতিতে 'নকর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ' প্রভৃতি শ্লোকদ্বয়ে তাহার মীমাংসা আছে। এতাবতা পরমেশ্বর স্তুতি নিন্দাতে তুষ্ট বা রুষ্ট হন না। বিশেষতঃ 'তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী' প্রভৃতি গীতা বচনে নিন্দা এবং স্তুতি যে ব্যক্তির পক্ষে তুল্য তাদৃশ মানবকেও প্রশংসা করিয়াছেন এবং শ্লোকেতেও যে ব্যক্তি স্তুতি নিন্দাতে মোহিত হন না তাঁহার প্রশংসা ও মহত্ত্ব দেখিতেছি। তখন পরমেশ্বর যিনি ন্যায় ও পবিত্রতার নিকেতন তিনি কখন নবকৃত স্তুতি নিন্দাতে মুগ্ধ হইতে পারেন না। যেমন মহদ্ব্যক্তির নিন্দা করিলে তিনি তাহাতে রুষ্ট হন না, কিন্তু যে নিন্দা করে সেই ঐ নিন্দাকরণরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে অর্থাৎ তৎকর্ম্মফলে আপনিই ম্রিয়মান হয় এবং সমাজে অনাদরণীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের নিন্দুক ব্যক্তি আপনার কৃত কর্ম্মের ফল আপনি ভোগ করে। ভগবান তাহাতে রুষ্ট হন না। 'অবমতঃশেতে' আর 'অবমন্তা বিনশ্যতি ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য যখন নরের পক্ষে প্রয়োগের সার্থক্য দেখিতেছি তখন পরমেশ্বরের তো কথাই নাই। বিশেষতঃ শ্রুতি আছে 'নহবৈ স্বশরীরস্য সতঃ প্রিয়া প্রিয়য়োরপহতিরস্তি' ইহা নিশ্চয় যে, শরীরের সহিত বিদ্যমান জনের অর্থাৎ জীবের প্রিয় এবং অপ্রিয় পরিত্যক্ত হয় না।—অজ্ঞান সমুৎপন্ন অবিবেক, অভিমান, রাগাদি এবং কর্ম্মোদ্ভব যে শরীর তদভিমানী ব্যবহারিক জীবেরই কেবল প্রিয় এবং অপ্রিয় ভোগ হয়। কিন্তু 'অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়া প্রিয়েষ্পৃশতঃ' ইহা নিশ্চিত জানিও যে যিনি অশরীরী নিস্তরঙ্গ, উপাধি রহিত পরমাত্মা, তিনি প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ত্তৃক স্পর্শিত হন না। সুতরাং তাঁহার তুষ্টি রুষ্টি নাই। যুক্তিতেও দেখ সদ্বিচারক যেমন বাদী প্রতিবাদীর প্রদর্শিত প্রমাণ ও সার্ব্বভৌমিক বিধি অনুসারে এক পক্ষকে জয় বা মুক্তি, অন্যকে পরাজয় বা দণ্ড দান করেন, তাহাতে তিনি উহাদিগের কাহারও গুরু স্তুতির পক্ষপাতী বা কাহারো নিন্দাতে রুষ্ট হন না, ভগবান সেইরূপ সাধুর জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের অবধারিত ফলস্বরূপ মুক্তি আর অসাধুকে পাপের নিশ্চিত ফলস্বরূপ দণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু কাহারো তাদৃশ স্তুতি নিন্দাতে বিচলিত হন না। যদি কেহ তাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ পানার্থ ব্যাকুল হইয়া সবলান্তঃকরণে তাঁহার নিকটে প্রার্থনারূপ স্তুতি করে, অথবা সেই সুধাপানপূর্ব্বক আনন্দে ধন্য বাদরূপ স্তুতি গান করে, তবে নিশ্চিত বুঝিও যে তাহার ঐরূপ ধর্ম্মই তাহাকে জয়দান করে। বিধাতার নিয়মই তাহা। নতুবা তদ্দ্বারা যে বিধাতার তুষ্টি অনুমান করিতে হইবে এমত নহে। তিনি ঐ নিয়ম বা ভক্তি অনুসারে ফলদান করেন মাত্র। কিন্তু স্বয়ং নির্লিপ্ত ও সমভাবেই থাকেন। তাঁহার এই সার্ব্বভৌমিক বিধির সন্নিধানে শুভাশুভ ফল কেবল কর্ম্মায়ত্ত। মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরকে (২।১।৩৪) লিখিয়াছেন 'বৈষম্য নৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।' জীবের প্রতি পরমেশ্বরের বৈষম্য নাই। অর্থাৎ তিনি কাহারো প্রতি রুষ্ট অথবা নির্দ্দয় হন না। জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসারে তিনি ফলদাতা, তাঁর [illegible]

দান করেন। পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জ্জন হয়, পাপেতে পাপ জন্মে, এমন কথন বেদে আছে। কিন্তু পরমেশ্বরেতে বৈষম্য নাই অনেকে এই নির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব এবং কর্ম্ম তত্ত্বের বোধাভাবে শাস্ত্রীয় মীমাংসা লাভে অপারক। তাঁহারা স্তব স্তুতিতে ঈশ্বরের তুষ্টি আর শুভ ফললাভের মূলে তাঁহার অনুগ্রহমাত্র থাকা মনে করেন এবং পক্ষান্তরে নাস্তিকের প্রতি তাঁহাকে দণ্ড বিধাতা রূপে দৃষ্ট করেন। কিন্তু শ্রীধরস্বামী লেখেন যে, এ প্রকার দণ্ডের নিয়মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদি ভগবানকেই দণ্ডদাতা বল, তবে সেই দণ্ডের মূলে তাঁহার অনুগ্রহ দর্শন করিও। এই প্রবোধ দিবার নিমিত্তে তিনি গীতার (৫।১৪) টীকায় মীমাংসা করিয়াছেন 'নিগ্রহোঽপিদণ্ডরূপোঽনুগ্রহ' ঈশ্বরের নিয়মিত যে নিগ্রহ সে দণ্ডরূপ অনুগ্রহ মাত্র। পুনশ্চ উক্ত শাস্ত্রের (৪।৮) স্থানান্তরে কহিয়াছেন 'লালনে তাড়্যন মাতৃর্ণা কারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেবমহেশস্য নিয়ন্তৃত্বং দোষয়োরিতি।' বালককে লালন পালন ও তাড়ন করায় যেরূপ মাতার নির্দ্দয়তা হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরেরও দণ্ডনিয়মে নির্দ্দয়তা সম্ভবে না। অতএব স্তুতি নিন্দাতে তাঁহার তুষ্টি রুষ্টি স্বীকার করিলেও সে তুষ্টি রুষ্টি তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের অন্তর্গত। তাহা তাঁহার হর্ষ বা ক্রোধস্বরূপ নহে। মানব যেমন কাহারো স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া সেই তুষ্টির আনন্দ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এবং শরীর পর্য্যন্ত গদ গদ ভাবে অনুভব করেন অর্থাৎ তাহা নিজে ভোগ করেন এবং নিন্দা জন্য অসহ্য ক্রোধ কর্ত্তৃক যেমন স্বয়ং ব্যাধিগ্রস্ত [illegible] সেরূপ ভোগাদি দোষ [illegible] পারে না। স্তুতি নিন্দাতে তাঁহার শান্তস্বরূপে তুষ্টি রুষ্টিরূপ বিকার হওয়া অসম্ভব। ফলতঃ এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, ঈশ্বরের স্তব স্তুতি ও উপাসনায় সুকৃতি ও সদ্গতি জন্মে। গীতার ১০ অঃ কহিয়াছেন যে তাদৃশ ভজনকারী ভক্তকে ভগবান ক্রমে এমন বুদ্ধি যোগ প্রদান করেন যদ্দ্বারা ভক্ত অন্তে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। শারীরকেও আছে পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদ বাদরায়ণঃ।' উপাসনা দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, বেদের এই মত মহর্ষি বাদরায়ণ কহিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে 'সর্ব্বাহস্মৈদেবা বলিমাহরন্তি।' ব্রহ্মোপাসককে দেবতারাও পূজা করেন। যদি কেহ যোগৈশ্বর্য্যাদি কামনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তিনি তাঁহাকে সে ফলও দান করিয়া থাকেন। 'আত্মানং চিন্তয়েৎভূতি কামং' যোগৈশ্বর্য্যাদি কামীজন পরমাত্মার উপাসনা করিবেক। এই শ্রুতিসমূহ শ্রবণে যদি এমত প্রশ্ন কর যে, সাধকের উপাসনা বা প্রার্থনাতে পরমেশ্বর কি স্বীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অন্যথাচরণ করিবেন? ইহার উত্তর এই যে, ঐ প্রকার নানারূপ পুরুষার্থলাভার্থে ঐরূপ প্রার্থনাই নিয়ম স্বরূপ। প্রার্থনাই জীবকৃত কর্ম্ম অথবা মন্ত্ররূপী। তাহাতে ফলদাতারূপে পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ। কিন্তু তাদৃশ ফলদানরূপ কার্য্যে তিনি নির্লিপ্ত। কেবল জীবের উপাসনারূপ কর্ম্মই তাদৃশ ফলের অব্যবহিত হেতু। বিধাতা সঙ্গ-রহিত হইয়া উক্ত কর্ম্মকে ফলদানে নিয়মিত করেন মাত্র। 'কর্ম্মই ফলদেয়' ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর তাহার নির্লিপ্ত নিয়ন্তা। সে ভাবে তাঁহাকে ফলদাতা বলিতে হয় বল, কিন্তু

তাহা বলিতে গিয়া তাঁহাতে পক্ষপাত দোষ অর্পণ করিও না। এইরূপ কেহ না বলে এজন্য মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরকে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩।২।৩৮ ৪১) 'ফলমত উপপত্তে' কর্ম্মের ফল কেবল চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে হয়। 'ধর্ম্ম° জৈমিনিরত এব।' জৈমিনি কর্ম্মবাদী ছিলেন। তিনি আপত্তি করিয়াছেন যে ঈশ্বরকে ফলদাতা কহিলে বৈষম্য দোষ হয়। অতএব জীবগণের কর্ম্মই ফলদাতা। পূর্ব্বপক্ষ বাদরায়ণোহেতু-ব্যপদেশাৎ" ব্যাসদেব দেখিলেন যে কেবল কর্ম্মকে ফলদাতা কহিলে চৈতন্যময় ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে এ নিমিত্তে তাহার মত এই যে 'ঈশ্বরই ফলদাতা' কিন্তু সে কথার মীমাংসা এই যে, অচেতন কর্ম্ম সকল হেতু স্বরূপ আর ঈশ্বর ফলদাতা স্বরূপ। 'কর্ম্মভি রারাধিত ঈশ্বর ফলদাতা' কর্ম্ম সাধন করিলেও ঈশ্বরই ফলদাতা। কিন্তু কর্ম্মানুসারেই তাঁহার ফলদাতৃস্বরূপ বিধি প্রবর্ত্ত হইয়া থাকে। নতুবা তিনি পক্ষপাত করেন না অথবা তাদৃশ নিয়ম বিধানে তিনি বিচলিতও হন না। তবে যে লোকে ঈশ্বরে বৈষম্য দর্শন করে, তাহা কেবল মায়িক। ভ্রমমাত্র। ফলতঃ বৈষম্য নাই। 'মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং' যেমন দৃষ্টি ব্যভিচার বশতঃ রজ্জুকে সর্প ভাবিয়া একজনের আতঙ্ক হয়, আবার মালা ভাবিয়া অন্য ব্যক্তির আনন্দ হয়, সেইরূপ শুভ কর্ম্ম করিয়া জীব পরমেশ্বরের প্রসন্নমুখ দর্শন করেন, ও অশুভ কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক দেখেন। ফলতঃ জীবের স্বকৃত-কর্ম্ম এবং কর্ত্তৃতত্ত্ব উপাসনাই ফলের হেতু। তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরে তুষ্টি রুষ্টি জন্মে না। ঈশ্বরও পক্ষপাত পূর্ব্বক কাহারও ভাল মন্দ করেন না।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, পাক্ষিক সমালোচক ও আমরা।

***

পাক্ষিক সমালোচকের সম্পাদক মহাশয়, মাঘমাসের দ্বিতীয় পক্ষের পত্রিকায়—'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামীও পাক্ষিক সমালোচক' নামে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার পাঠকমণ্ডলী একটি অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন সন্দেহ নাই—যেহেতু সহযোগী লেখকের সহিত সম্পাদকের বাদ প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্ক একটি নূতন কথা—সাহিত্য সম্বন্ধে। এই প্রকার বাদ বিতণ্ডাকে, আমরা ভাষার পুষ্টি সাধনী বলিয়া বিবেচনা করি।

প্রতিবাদের সহিত পৌরুষ, জিগীষা ও কর্কশবাক্যের কেমন একটা স্বাভাবিক সংযোগ; তথাপি বাদ বিতণ্ডাস্থলে কার্কশ্য ও পৌরুষকে দূরে রাখিয়া, কেবল যুক্তি-দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করা যে সুরুচিকর সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা প্রাচীন কবি ও কাব্যের পরিশিষ্টে যে সুর অবলম্বন করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের

টিপ্পনীর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, বিংশ সংখ্যক পাক্ষিকে সম্পাদক মহাশয় তদপেক্ষা একটু সুর চড়াইয়াদিয়াছেন, সুতরাং এখন আমাদের চেঁচিয়ে বলিবার পালা উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের মুখবিনির্গত শব্দগুলা যাহাতে ক্যাট্‌কেটে না হইয়া কোমল হয়, অথচ সম্পাদক মহাশয়ের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে, তাহারই চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য—আমরা বিনয়ের ভাষায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দুই চারিটী উত্তর দিব।

'অদ্ধীভবন্তি সর্ব্বত্র প্রতিবাদপরায়ণাঃ।'

প্রতিবাদ করিতে গিয়া এ প্রাচীন রীতিকে আমরা ভাল বোধ করি না, সুতরাং এ রীতিকে অবলম্বন করিয়া আমরা একটি কথাও বলিব না, সেহেতু উটি একটি দোষ।

প্রতিবাদের মুখবন্ধ করিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় একস্থলে পাকতঃ আমাদিগকে পাঠশালার ছাত্রগণের সহিত তুলনা করিয়া দুই একটি কথা বলিয়াছেন, অপরাধ এই যে, 'শব্দের ছটায় ও অনুপ্রাসের ঘটায় কবিতা হয় না' সর্ব্বদেশব্যাপি এই বাক্যটি আমরা প্রবন্ধের স্থানবিশেষে উল্লেখ করিয়াছিলাম—সম্পাদকগণের দূরদর্শী নয়ন তত্ত্বানুসন্ধানরূপ উচ্চ বেদী হইতে যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবে তাহাকে ভ্রমাত্মক মনে করা অপেক্ষা আপনাদিগের নয়নকে কামলাদূষিত ভাবিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু 'আমি বড় বুঝি' নামে যে একটা ভাব আছে, সেই ভাবটা এই জগতের প্রত্যেক মনুষ্যের শিরায় শিরায়—হাড়ে হাড়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জানি না, হয় ত, সেই ভাবটা আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়াই হউক অথবা নৈসর্গিক অন্য কোন কারণেই হউক—আমরা ক্ষুদ্র নব পিপীলিকা—পাত্তেড়ে পোড়ো, এখনও বুঝিলাম না যে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বুঝিয়াছেন যে, 'শব্দের ছটায় আর অনুপ্রাসের ঘটায় কবিতা হয় না।'

আমরা ঘুঁণে কাটা, ছাতাধরা কতকেলে পুরাতন কথা প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গম্ভীরভাবে বিদ্রূপের ভাষায় লিখিয়াছেন—'একথা বুঝাইবার জন্য ছন্দে বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া উপদেশ দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করা অতিরিক্ত।'

সর্ব্ববিদিত কথা বা বাক্যবিশেষ প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করা যদি একটা দোষের কথা হয়, তবে সম্পাদক মহাশয় রামপ্রসাদের কবিত্ব সমালোচনে 'ভাষা বনাম ভাব আর ভাব বনাম ভাষা' এই দুই পুরাতন মোকদ্দমার কথা কেন তুলিলেন বুঝিতে পারি না।

লিপি লেখার পর সম্পাদক মহাশয় আর একস্থলে বলিয়াছেন—'ইহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিকও বটে' কিন্তু কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন কিছু না বলিয়া মৌনীভাব অবলম্বন করা ভাল দেখায় না। ভাবুকের হৃদয়স্থিত ভাবের এমনি একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে, যখন উহা বাহির হইয়া আপনার উজ্জ্বল আভা চারিদিকে বিকীর্ণ করে, তখন ভাষাকে দূরে ফেলিয়া একাকী আসে না, ভাষাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হয়। ভাব হইতেই ভাষার জন্ম, যদি কোন ভাব ভাষার অপেক্ষায় সুগঠনে গঠিত না হইল তাহা হইলে, সে দোষটা আমরা ভাবের স্কন্ধেই আরোপ করিয়া থাকি।

সাহিত্য জগতে ভাবুকের ভাষায় জড়তা বা অস্পষ্টতা কখনই লক্ষিত হইবে না, বরঞ্চ বাকাবাগীশদিগের—'কুপিতকৃপিক পোলাস্তর্গতোড়ুম্বর মশকবৎ' এবম্প্রকার ভাষার ঘর্ঘরাণীর মধ্যে পড়িয়া সমাসের ঠাসুনিতে ভাবের মশা মাছি অবধি ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়া বসে।

এতক্ষণে বাজে কথায় সম্পাদক মহাশয়ের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিলাম। তিনি রুচির কথা তুলিয়া বলিয়াছেন—'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ,' এক্ষণে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইল :—

সম্মানপূর্ণ সম্পাদকীয় বেদীতে বসিবার পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই—'ভিন্নরুচিহি লোকঃ' এই কথাটা অনেকবার ভাবিয়াছিলেন, তাই পাক্ষিকের আবরণে বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন (প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী), কিন্তু আমাদিগের দুরাদৃষ্টবশ তিনি আত্মকৃত নীতি হইতে স্খলিত হইয়া, সাহিত্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তেকেলে লোক বলিয়াই কটা সেকেলে কথা বলিতেছি—শিক্ষাভেদে রুচিভেদ। ভাব গোপনকেও আমরা অরুচির মধ্যে ফেলিয়া থাকি, তাই অরুচির হাত হইতে মুক্তি পাইবার বাসনায়, বিদ্যাসুন্দরের কবি রামপ্রসাদের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, যে 'রামপ্রসাদের কবিতায় প্রচুর পরিমাণে নীচ রসিকতা আছে—প্রকৃত কবিত্ব নাই বলিলেও চলে' এখনও আবার তাই বলিতেছি—আমাদিগের মতটা এমনি বেরাড়া যে সম্পাদক মহাশয়ের গভীর কণ্ঠস্বরেও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল না।

আমাদিগের প্রকাশিত অভিমতের নিগূঢ় তাৎপর্য্যধ্বনি অথবা ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা সম্পাদক মহাশয়ের বুঝিয়া লওয়া উচিত ছিল যে আমরা রামপ্রসাদকৃত বিদ্যাসুন্দরকে লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের মত ব্যক্ত করিয়াছি।

Burnsএর সহিত রামপ্রসাদের তুলনা !! Burns, কবিকুলশিখামণি সেক্ষপিয়রের সমকক্ষ, তাহার সহিত সংকীর্ণ কল্পনা-চালিত রামপ্রসাদের তুলনা কেমন করিয়া কবির বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ তুলনায় যদি রামপ্রসাদের গৌরব বৃদ্ধি হয়, তবে ইহাকে জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করিয়া লইব, আবার যদি এইরূপ বল চালিত উপমায় উপমেয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে মনে বড় ব্যথা পাইব। Burnsএর একটি অতি ক্ষুদ্র উজ্জ্বলরসবিমিশ্রিত 'A Fond Kiss' নামক কবিতা সম্বন্ধে সার ওয়াল্টার স্কট্ বলিয়াছেন—'These exquisitely affecting Stanzas contain the essence of a thousand love tales.' কবিতার হৃদয়ের সুধা ভাবুক অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু গানের সহিত যতক্ষণ স্বরতালের গলাগলিও মাখামাখি না হয় ততক্ষণ গানের মাধুর্য্য আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই না। যে সকল গান আমাদিগের শ্রবণ বিবরে পীযূষ ঢালিয়া দেয়, কবিত্বের অসদ্ভাবেও তাহা সুখময় বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি জন্মে।

রমেশ বাবুকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; তবে তাঁহাকে মহাজনপদের অন্যতম বলিয়া, স্থির না করিলেও সম্পাদক মহাশয় যে 'তাঁহার অভিমত বিশেষজ্ঞের অথরিটিরস্বরূপ গণ্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত

হইবেন না' একথাতেও আমরা সুখী হইয়াছি, কিন্তু বনেশবাবু যদি আমাদের বিদ্যাদের কথাটায় কাণ দিয়া থাকেন, তবে, একথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি যে তিনি মনে মনে কিছু লজ্জিত হইবেন। তর্কের খাতিরে সম্পাদক মহাশয় যাহাই কেন বলুন না, শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ত্তমানকালের প্রথিত নামা যে কোন ব্যক্তিকে প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া মনে করিতে লজ্জিত হইবেন।

তার পর পোপের সহিত রামপ্রসাদের তুলনা কে করিল যে, তাই লইয়া এত বাগ্বিতণ্ডা। সমালোচকেরা সময়ে সময়ে গভীর ভ্রমকূপে পতিত হন, তাই দেখাবার জন্য বাইবন্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই লিখিয়াছি। Burns এর সহিত রামপ্রসাদের যে কি সাদৃশ্য আছে তাহাও বুঝিতে পারি নাই,—যদি এক গ্রাম্যদোষে রামপ্রসাদ Burns হন, তাহা হইলে, বটতলার কাজি ফকিউদ্দীন কি অপরাধ করিলেন? স্বীকার করি যে, রামপ্রসাদের কতকগুলি গান পৃথিবীকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে—প্রাণ হইতে বাহির হইয়াছে—কিন্তু সেরূপ গানের সংখ্যা বড় অধিক নহে, কবিগুরি ওঁকারচুপি দেখাইবার নিমিত্ত তিনি অনেক সময়ে অনেক গান রচনা করিতেন। রমণীগণের 'শ্রী' নির্ম্মাণের ন্যায় যিনি গানের মধ্যে অথবা কবিতার মধ্যে অধিক পরিমাণে রচনাচাতুর্য্য দেখাইতে যান তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের কবি বলিয়া কখনই ডাকিব না। তবে সাধক রামপ্রসাদ চিজ্জড়গ্রন্থি খুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, আমাদের পূজ্য, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি ভক্তগণের ন্যায় কালী অথবা দুর্গাকে ঘরের মা'র ন্যায় দেখিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন তাই তিনি শ্রদ্ধেয়। তাঁর গানে কল্পনার কোনরূপ জ্যোতিঃ না থাকিলেও কেবল আধ্যাত্মিক বিষয় বলিয়া, হিন্দুসাধারণে সেই গানে একেবারে গলিয়া যায়।

যাক্ সে কথা—এখন, রামপ্রসাদের কবিতায়, সম্পাদক মহাশয়ের স্বীকারমতে যদি 'উচ্চ অঙ্গের কল্পনা, সূক্ষ্মবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সৌন্দর্য্য বৈচিত্র, বা স্বপ্নরাজ্যের মেটে মেটে জ্যোৎস্নার আধ আধ আলছায়া' এ সকল কিছুই না থাকে, তবে আবার ষোলআনা প্রকৃতিত্ব থাকিল কিরূপে?—প্রকৃত হইতে দি সৌন্দর্য্য বৈচিত্র গেল, জ্যোৎস্না গেল, ত. আবার ষোল আনা কিরূপে থাকিল? জমায় ষোলআনা খরচ তার পনের আনা আবার বাকিতে পুঁই ষোল আনা—এইরূপ প্রহেলিকায় যদি রামপ্রসাদ পূরা কবি হন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের এক-স্থলে লিখিয়াছেন—রামপ্রসাদের কবিতায় 'উচ্চ অঙ্গের কল্পনা, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সৌন্দর্য্য বৈচিত্র বা স্বপ্নরাজ্যের মেটে মেটে আল ছায়া নাই—রামপ্রসাদের ঐ সকল গুণ নাই স্বীকার করিয়া, আবার অন্যস্থলে বলিতেছেন 'হৃদয়ের এতাদৃশ অদমনীয় বৈদ্যুতিক বেগ, এতাদৃশ সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্য-সৃজন-শক্তি যদি কবিতা না হয়, তবে কবিতা কি? এইস্থলে যেরূপ আত্ম মত-বিরোধিতা ঘটিয়াছে তাহার বিচার পাঠক মহাশয়েরা করিবেন।

'রামপ্রসাদের কবিতা তাঁহার বিশ্বাস' হাঁ—রামপ্রসাদের অটলবিশ্বাসে আমাদের গাঢ় শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বিশ্বাসে যে কবিত্ব

হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ শুনিয়াছি বটে' কিন্তু বিশ্বাসে কবিত্বের কথা কখন শুনি নাই।

দুই একজন লোক আছে তাহারা প্রথমে চড়ক গাছে উঠিতে চায় না, তার পর পাঁচজনের বলাকওয়াতে পিট ফুঁড়িয়া চড়কগাছে ওঠে ও দেপাক দেপাক শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ অবলেপের কোন কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে বিনয়ের পুরাতন বচনটি একবার আবৃত্তি করিয়া, পৃথিবীর লোক সাধারণ স্বাভাবিক কণ্ঠের আলাপন করিয়া থাকে, তার পর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সকল সুরকেই আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে নূতন কথা শুনিয়াছেন বলিয়া, উচ্চস্বরে পাঠকগণকে বলিয়াছেন—'অহো! মনুষ্য বাঁচিয়া থাকিলে কত নূতন কথা না শুনে!' আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সম্পাদক মহাশয়ের উচিত, তাহা না করিয়া তিনি মাঝামাঝি বৈর্য্যচ্যুত হইয়া সাহিত্যসংগ্রামে যে কেন প্রবৃত্ত হইলেন বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক কবিরঞ্জনের সম্বন্ধে এই বাদানুবাদ করিতে গিয়া স্খলিত বাক্ হইয়া থাকি, তাহা হইলে, সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

কাননবালা।

(গার্হস্থ্য কথা।)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিনের উজ্জ্বলভাব ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেবও ঝোপের মধ্য দিয়া গাছের ভিতর দিয়া—নিবিড় পত্রপুঞ্জভেদ করিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিলেন। বালা রবির কিরণস্পর্শে কানন আর এক নূতন আকার ধারণ করিল; সে সৌন্দর্য্যরাশি ভাবুকের চিত্ত মোহিত করে,—ক্লিষ্ট প্রাণ শীতল করে—যে দেখে সে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না, এক অভূতপূর্ব্ব মহান্ ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়!

বালা তখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। কুটীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া সূর্য্য কিরণ আসিয়া বালার সর্ব্বাঙ্গ আলোকরঞ্জিত

PRINTER'S CERTIFICATE.

I Nerode Ch. Mookerji do hearby certify that the accompanying book was first delivered out of the Press on the 30th day of March 1886.

DURBHUNGA
THE 30th March 1886

Nerode Chunder Mookerjee
Printer

STATEMENT

Title of the Book	Pachhuch Samatiech
Language	Bengalee
Name of Author.	Amrutajuchad Agnihotri Mookerjee
Subject	Miscellaneous Literature
Place of Printing	Durbhunga
Place of Publication	Durbhunga
Name of Printer	Nerode Chunder Mookerjee
Name of Publisher	Nerode Chunder Mookerjee
Date of Issue	3rd March
Size and Number of Pages	Royal 8 vo Octavo, 32 pages
Number of the Edition	2nd Issue
Number of Copy	500
Printed or Litho-Graphed	Printed
Price	As 4 annas

করিয়াছিল। কিরণের চক্ষে সে দৃশ্যও বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছিল!

ক্রমে একটু একটু করিয়া বেলা হইতে লাগিল। কানন ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিল, চাহিয়াই কিরণকে শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া পুলকে হাসিয়া, উঠিয়া বসিল।

কিরণও একটু হাসিয়া বলিল,—"কেমন বালা। নিদ্রা হইল?"

সে স্নেহপূর্ণস্বরে বালা আনন্দে অধীর হইল,—কিরণের ক্রোড়ে আবার শুইয়া পড়িল, গদগদকণ্ঠে বলিল, "না আমি আবার ঘুমাইব।"

কিরণ সযত্নে ক্রোড় বিস্তার করিয়া বালার মস্তক রক্ষা করিলেন,—উভয়েরই হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—সে আনন্দের সীমা নাই, ঊন নাই, তাহা অনন্ত—অপরিমেয়, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না—সে পবিত্রভাব, পবিত্র হৃদয় ভিন্ন বুঝিতে পারে না। আহা! বালা ভাবিল ইহাই স্বর্গ—অথবা পৃথিবীতে যদি স্বর্গের কিছু নিদর্শন পাইতে হয়—তাহাই এই।

কিরণ সেইরূপ আদরে, সেইরূপ স্নেহময় কণ্ঠে কহিল,—'বালা। তুমি মাটিতে পড়িয়াই ঘুমাইতেছিলে?'

'কখন?'

'রাত্রিতে।'

'কেন—আমি ত অজিনেতেই শুয়েছিলাম।'

'সকাল বেলা মা তোমায় মাটিতে দেখিয়া অজীনে শুয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।'

'হয়ত আমার খুব ঘুম পেয়েছিল—তাই খসিয়া বসিয়া অমনি ঢুলিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলাম,—পড়িয়া ঘুমাইতে ছিলাম!'

'হ্যাঁ বালা!—ঘাড়ে, পিঠে, বুকে, কি হাতে পায় কোনখানে বেদনা হয় নাই ত? যে কুঞ্চিত হইয়া শুইয়া ছিলে—আহা। দেখিলে বড় ক্লেশ হয়!—মা কত দুঃখ করিলেন।'

বালা গা, হাত, পা একবার আন্দোলন করিয়া কহিল, 'কই—কোন খানেই ত ব্যথা হয় নাই,—আমি কত দিন ঐ রকম ক'রে ঘুমিয়ে পড়ি, আর মা আহ্নিক করেন, আমাকে অজীনে শোয়াইয়া দেন, আমার জন্য মার কত কষ্টই পেতে হয়। কাল ভাই—ভেবেছিলাম, তোমায় একথা ব'লব না, কিন্তু তোমায় কোন কথা না ব'লে যেন থাকিতে পারি না—আমরা ভাই কাল সব ফল খেয়ে ফেলেছিলাম—মার কাল কিছু খাওয়া হয়নি।'

'তা' এ কথা আমায় বলিবে না—ভেবেছিলে কেন?'

'যদি শুনে তোমার কষ্ট হয়।—আর পাছে তুমি ভাব, তোমার জন্য মার খাওয়া হ'ল না—তা হ'লে তুমি যদি আর না আস!'

'বালার এক নূতন প্রকৃতি। মার জন্য চিন্তা আমার জন্যও চিন্তা, দুই দিকেই সমান আকর্ষণ—একি বালা? বাস্তবিক আমি বুঝিতে পারি, আমার আসায় মার বড় ক্লেশ হয়,—সেই জন্যই আমি এবার অনেক দিনের পর আসিয়াছি,—আর শীঘ্র আসিব না।'

বালা ক্রোড় ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল,—উৎকণ্ঠার সহিত বলিল,—'না না না তা' হবে না, তা' হ'লেও মার বড় কষ্ট হবে, মা সদাই তোমার নাম করেন,—তুমি অনেক দিন আসনি ব'লে মা কত

দুঃখ করিতেন,—আমিও ভাবিতাম—বুঝি তোমার আমাদের আর মনে নাই।'

কিরণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

'তবে কি হইবে!—আসিলে কোন বিষয়ে না কোন বিষয়ে তোমাদের কষ্ট হইবেই,—না আসিলেও তোমাদের কষ্ট হইবে—ইহার উপায় কি?'

'না—তেমন কিছু আমাদের কষ্ট হয় না, বরং তুমি এলে মাকে তবু হাসিতে দেখি, অনেক কথা কহিতে দেখি, বোধ হয় আমার মত মার মনেও বড় আনন্দ হয়। মার ত আর কোন কষ্ট হয় না,—এখানে ত অধিক ফল পাওয়া যায় না—যা পাওয়া যায়, দুজনের দুবেলা অল্প অল্প খাওয়া চলে, তুমি এলে তিন জনে সেই ফল খাইতে হয়, তা আমি খাব না, তা' হ'লে ত আর কারুর কোন কষ্ট হবে না।'

'তুমি খাবে না কেন?—আমার না খাওয়াই উচিত। তোমাদের এই সামান্য আহারের আমি অংশ লইতে আসি কেন?'

'কেন তুমিত যখনই আস, আমাদের জন্য কেমন সুন্দর সুন্দর খাবার আন, হ্যাঁ ভাই! মা তা' খান না কেন?'

'সেই তোমাকে একদিন স্ত্রীলোকের সধবা, বিধবা ও কুমারী অবস্থা কাহাকে বলে সবত বুঝাইয়া দিয়াছিলাম,—মনে নাই কি?—তোমার মাতা বিধবা, বিধবার অন্য পাককৃত দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ।

'আমি যদি পাক করিয়া দিই, তাত তিনি খান,—তুমি সেই একবার চা'ল এনে ছিলে, আর সেই কি ফল, তা' আমি সিদ্ধ ক'রে মাকে দিলাম তা'ত মা খেলেন!'

'তুমি কন্যা, তোমার হস্তকৃত আহার গ্রহণে কোন দোষ নাই। মনুষ্য সমাজ মধ্যে জাতি বিভাগ আছে, কোন দেশে জাতি ধর্ম্মগত, কোন দেশে জাতি অর্থগত, আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মগত জাতি-ভেদ প্রথা আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই কয় প্রধান জাতি আছে, তাহার পরে অনেক বর্ণ শঙ্করও উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা শূদ্র, আমাদের অপেক্ষা নিম্নজাতির হস্তপক্ক বা স্পর্শজনিত অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্ন আমাদের গ্রহণ বিধি নহে, কিন্তু আজি কালি অনেকে তাহাও করিতেছেন।'

'কেন—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ কেন?'

'ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান এই জন্য।'

'একি ভাই!—ভগবানেরই ত সব সৃষ্টি, ইহার ভিতর আবার উচ্চ নীচ কেন?'

'পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমাদের জাতি-ভেদ ধর্ম্মগত, ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মে আমাদের অপেক্ষা উচ্চ, এই জন্য তাঁহারা জাতির প্রধান। ভাল, মন্দ, উচ্চ নীচ, জগতের নিয়ম। জগতে উচ্চ নীচ নাই, ভাল মন্দ নাই, সংসারী এ কথা কিছুতেই বলিতে পারে না। যিনি বলেন জাতি বিচার করি না, সকলি সমান, তিনি ভিতরে ভিতরে অধিক জাতি বিচার করেন। তবে কাহারও ধর্ম্মগত—কাহারও অর্থগত। আমাদের দেশে এখন যাঁহারা রাজা তাঁহাদের দেশে অর্থগত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, অর্থ হইলেই অতি নীচ জাতিও মান্য গণ্য হইয়া উঠে, অর্থ না থাকিলে সমাজে সে ঘৃণ্য হইয়া থাকে—কেহ তাহার সহিত আহার করে না! আমাদের দেশীয়

লোকেরা ইংরাজের রীতি, নীতি, সভ্যতা, ভব্যতা অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের ধর্ম্মগত জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া অর্থগত জাতিভেদের ব্যবস্থা দেখিতেছেন।—আমাদের শিক্ষা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

"না—ভাই। যদি উচ্চ নীচই রাখিতে হয়, যে ধর্ম্মে বড় সে বড় থাকুক, কিন্তু অনেক অর্থ আছে ব'লে যে সে বড় হবে, সেটা ভাল নয়। তা' হ'লে ধর্ম্মের অপেক্ষা অর্থের মান অধিক বাড়ান হয়,—তবে ভাই। যাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থকেই সার ভাবে, তাহারা আমাদের ধর্ম্মগত জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া অর্থগত জাতিভেদের পরামর্শ দিবে না কেন?"

"আজি কালি শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে সেই ভাবই প্রবিষ্ট হইতেছে!'

'তাঁহারা শিক্ষিত—তবে তাঁহাদের এ মতি কেন?—তাঁহারা ভাল মন্দ বুঝিতে পারেন না?'

'বুঝিতে পারিতেন, যদি তাঁহারা তাঁহারাই জগতের প্রকৃত বোদ্ধা এরূপ বিবেচনা না করিতেন; আমাদের পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণকে তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন—আবার কেহ কেহ আপনাকে তাঁহাদের অপেক্ষাও উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হন না; আত্মম্ভরিতা ও পরানুকরণ প্রিয়তাই আমাদের সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাক্ বালা! সে কথায় আমাদের কাজ নাই, পরে যা' করে করুক্, আমাদের স্বদেশের উপর, স্বজাতির উপর, এবং স্বধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলেই হইল।'

'কিন্তু তুমি বল, আবার শীঘ্র শীঘ্র আসিবে ত?'

'আবার আসিতে বলিতেছ?'

'না, তুমি আসিও,—আমার খাদ্য তুমি খাইও—'

'আর তুমি খাইবে না?'

কানন কিরণের স্কন্ধে মাথা রাখিল,—উচ্ছ্বাসিত মনের বেগ যেন কতক শান্তি করিয়া বড় মৃদুকণ্ঠে যেন কিছু অন্যমনা হইয়া বলিল,—

'তুমি যখন আস, আমার যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না।—আর তুমি যদি সর্ব্বদা আমার কাছে বসে থাক, আমি বোধ হয় না খেয়ে সমস্ত দিন তোমার কাছে ব'সে থাকিতে পারি। তোমাকে মনে পড়িলেও আমার ক্ষুধা যেন চ'লে যায়।—তোমার কথাই ভাবি—আবার কখন কখন তোমা কেও ভাবি না—আর কাকেও ভাবিনা কেবল চুপ করে বসে থাকি—তখন শুধু ক্ষুধা কেন আমার লতাগুলি আমার মধু পায়ী তাহাদের কথাও ভুলে যাই—কি ভাবি তা' জানি না—অথচ যেন কত কি ভাবি—কেন ভাই।—এর কারণ কিছু বলিতে পার?'

কিরণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, কহিলেন,—'কি বালা—ক্ষুধা থাকে না তাই—ঠিক বলিতে পারি না—বোধ হয় চিন্তার প্রাবল্যে এমন হয়! হ্যাঁ বালা! মা এখনও আসিতেছেন না কেন? ক্রমে বেলা হইতেছে,—আমি আজিই যাইব।'

বালার মুখখানি শুকাইয়া গেল, প্রফুল্ল ব্রততী মূলোৎপাটিত হইলে যেমন আড়ষ্টা হইয়া পড়ে, সে সজীবতা ও প্রফুল্লতা আর

তাহার থাকে না, বালিকার মুখের ভাবও তেমনি হইয়া গেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে কহিল,—

'মার পূজা করিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে, তিনি আগে আসুন, তিনি আজি তোমায় যাইতে দিবেন কি না কেমন করিয়া জানিলে?'

'আজি যাইতেই হইবে, প্রয়োজন না থাকিলে আজি অবশ্য থাকিতাম। আমি গেলে তোমার মন কেমন করে বুঝিতে পারি—'

'না মন কেমন কই ত করে না—'

বলিতে বলিতে বালার কণ্ঠরুদ্ধ হইল,—এক ফোটা দুই ফোটা অশ্রু ক্রমে কপোল বহিয়া পড়িল। দুই তিনবার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল, সে অনন্ত প্রবাহিনী আর থামিতে চাহে না; কিরণ আপনার বস্ত্র দিয়া বালার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, কহিলেন,—

'কাঁদিতেছ কেন বালা?'

'না, আর কাঁদিব না।'

তখন বালা চক্ষু মুছিয়া বেশ স্থির হইয়া বসিল, কিন্তু সে হাসিমুখ আর নাই,—বর্ষণ নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু আকাশ নির্ম্মল হইল না—ভীম ঘনঘটায় আকাশ ছাইয়া রহিল।

সেই সময়ে কুটীরবাসিনী স্নানান্তে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া কাননকে দেখিয়া কহিলেন,—

'এই যে মা উঠিয়াছ!—আহা! বাছা কাল সমস্ত রাত্রি মাটীতে প'ড়ে—কোন অসুখ হয়নি ত মা?'

সেই আকাশভরা মেঘে একবার বিদ্যুৎ হাসিল, বালার ওষ্ঠে একটু হাসির বিকাশ হইল, বলিল, "না মা। আমার কোন অসুখ হয় নাই।' তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া কিরণকে ডাকিয়া কহিল,—'এস ভাই। আমরা ফল আনিতে যাই।'

কিরণ কাননের পশ্চাদানুবর্ত্তী হইলেন।

শ্রীনিঃ—

জগৎরামরায়ের রামায়ণ।

ভরত-সম্বাদ।

বশিষ্ঠ বলেন শুন ভরত কুমার,
যারপর সারাৎসার কথা নাহি আর।
শুন মর্ম্ম রাম ব্রহ্ম দেখনা আকৃতি,
লক্ষ্মী অবতীর্ণা হন নিজে সীতা সতী।
লক্ষ্মণ অনন্ত হন দেখ বিদ্যমানে,
ভূভার নাশিতে দশরথের ভবনে।
বনবাস ছলে রাম বধিতে রাবণ,
এ নিমিত্ত ভারতে জন্মিলা ভগবান্।
অরণ্য নিবাসী লক্ষ লক্ষ ঋষি যোগী,
কল্পাবধি তপ করে দরশন লাগি।

সে সবার তপ সিদ্ধ করিবার হেতু,
কানন গমন কৈলা প্রভু দেবকেতু।
শ্রীরামের রাজ্য ভঙ্গ কৈকেয়ীর বাদ,
এ নিমিত্তে চিত্তে কোন না গণ প্রমাদ।
কৈয়েয়ীর কণ্ঠে সরস্বতী আবির্ভূতা,
তেঁই সে বলিল বাপু যত দুষ্ট কথা।
কৈকেয়ীর দোষ দেওয়া সে অতি অধর্ম্ম,
এ সকল হইল বাপু দেবতার কর্ম্ম। (১৫)
ঘন শ্যাম ঘরে ঘুরে না যাবে নিশ্চয়,
ভাবহ ভরত কত কার্য্য নষ্ট হয়।
চল ঘর বাক্য ধর ভরত রাজন,
নিরন্তর অন্তরে ভাবহ রামধন।
আদি দেব আত্মা রাম কৌশল্যা তনয়,
যাঁর নাম জপমাত্র যম পায় ভয়।
স্বপক্ষ বিপক্ষ রাঘবের নাই দিশা,
যার যেমন ভজন তেমন পূর্ণ আশা।
ইষ্ট হয়ে নিষ্ঠ তত্ত্ব বলিনু নিগূঢ়,
অতি শুধি হৃদি তুমি না বটহ মূঢ়।
এ শুনি গুরুর বাণী ভরত বিস্ময়,
নয়নে বয়ানে তার প্রেম ধারা বয়।
রাম পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান হৃদি মাঝে হলো,
বিষয় বাসনা বৃথা খেদ দূরে গেল।
লোমাঞ্চিত পুলকে কম্পিত স্বরভঙ্গ,
হৃদে উথলিল প্রেম সিন্ধুর তরঙ্গ।
ভক্তি করি মতি কৈলা গুরুর চরণে,
ওহে ইষ্টদেব তুষ্ট হৈনু এতক্ষণে।
অন্ধকার নাশ কৈলে জ্ঞান দীপ দিয়া,
প্রভু পদে প্রণমি বিদায় হব গিয়া।
এই বলি বাহু তুলি যাইয়া নিকটে,
প্রদক্ষিণে পদে পড়ে হয়ে পানি পুটে।

(১৫) শ্রীরামের লাঞ্ছনায় দশরথ ও কৈকেয়ীকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করা কবির পক্ষে কি সুরুচির চিহ্ন!

দয়া কর পরাৎপর দেব পুরাতন;
চর্ম্ম চক্ষে চিনিতে নারিনু সনাতন।
জ্যেষ্ঠ ভাই বলি মোর মনে জ্ঞান ছিল,
তুমি চিদানন্দকন্দ (১৬) এখন জানিল।
কতশত দোষ হে করেছি ভাই ভাবে,
বচনের ত্রুটি কত করেছি মাধবে।
শিশুকালে কোলে চাপি করিয়াছি খেলা,
অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গনে দিনু কত ধূলা।
তব মায়া মোর কায়া ব্যাপৃত সর্ব্বদা,
আমোদ করেছে দাস কত বলি দাদা।
নিজ দাসে দয়া করি হরি কর ক্ষমা,
আমি মূঢ় নিগূঢ় কি জানিব মহিমা।
এই বলি কৃতাঞ্জলি করিলা সাষ্টাঙ্গে।
একালে কমল আঁখি বলেন ভরতে,
একে ভাই তাতে ভক্ত ভরত আমার,
অন্য অন্য জনে ভাব্য ভাবনা কি তার (১৭)
অতি প্রিয় পাত্র ভাই মোর নেত্র তারা,
কিন্তু মোর বাক্য রাখ এই কর্ণ সারা।
মাতৃবর্গে বুঝাইয়া লয়ে যাও ঘরে,
রাজা হয়ে প্রজা পাল অযোধ্যা নগরে।
পরজায়া মানিবে যেমত নিজ মাতা,
পর বিত্তে লোভ চিত্তে না করিও ভ্রাতা।
মর্য্যাদক জনের মর্য্যাদা সদা রাখ,
নীচ সনে আলাপ না হয় যেন দেখ,
শত্রুর অসহ্য ধৈর্য্য সদত করিবে, (১৭)
সম্পদে বিপদে সদা বিনয় বলিবে,
দেবতা দ্বিজেতে হবে সাবধান অতি,

(১৬) কন্দ শব্দের অর্থ মূল, এখানে চিদানন্দ কন্দ এক পদ হইয়াছে। চিদানন্দ কন্দ বলিলে জ্ঞান ও আনন্দের উৎপত্তি স্থান বুঝায়।

(১৭) ইহার অর্থ কি, যে ধৈর্য্য শত্রুর অসহ্য?

পুত্র তুল্য প্রজারে পালিবে নিতি নিতি।(১৮)
বুঝিয়ে বিহিত কর তুমি সুচতুর,
সকলে বচন বল অতি সুমধুর।
আত্ম বন্ধুবর্গ সৈন্য সামন্ত লইয়া,
ঘরে ঘুরে শীঘ্র যাও প্রণতি করিয়া।
তখন ভরত কন শুন সনাতন,
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য লঙ্ঘে কোনজন ?
কিন্তু ওহে চিন্তামণি মোর বাক্য ধর,
আপন পাদুকা মোরে সমর্পণ কর।
রাজপাটে পাদুকা উপরে ছত্র ধরি,
প্রতিদিন পূজিবারে আজ্ঞা দেহ হরি।
তব তুল্য মূল্য সেই পাদুকা পূজিব,
শিক্ষা যেন দিলে করি যতেক পারিব।
এত বলি কুশে কৈলা পাদুকা নির্ম্মাণ,
পদেতে পাদুকা পরিলেন ভগবান্।
সে পাদুকা শিরে ধরি ভরত রাজন,
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া প্রভুর চরণ।
বিদায়ের কালে কন শুন সনাতন,
তোমার নিকটে প্রভু করে যাই পণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হবে যেই দিন,
সেদিনে না দেখা পেলে ত্যজিব জীবন।
শ্রীরাম বলেন ভাই সেই কার্য্য হবে,
চৌদ্দবর্ষ পূর্ণ দিনে মোর দেখা পাবে।
এই ক'ট (১৯) নিকটে করিলা রঘুপতি,
কতক্ষণে গমনে ভরত কৈলা মতি।
প্রয়াগে উদ্যত সৈন্য সামন্ত লইয়া,
একালে কৈকেয়ী বলে শ্রীরাম ডাকিয়া।
পুরাণ অদ্ভুত রঘুনাথ সুত গায়,
জগতে বিপদে রাম রেখ রাঙ্গা পায়।

(১৮) এ উপদেশ, সেক্ষপীয়রে পলোনিয়সের সন্তানের প্রতি উপদেশ হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

(১৯) কট প্রতিজ্ঞা।

কেকয় নন্দিনী, করি পুট পাণি,
বামেরে নিভৃতে করি,
নেত্রে জল ধারা, হইয়া আতুরা,
কাঁদি বলে ধীরি ধীরি।
শুন রঘুপতি, অগতির গতি,
কুখ্যাতি হইল মোর।
এ ভারত মাঝে, মরি লোকলাজে,
দুষ্টতা করিয়া তোর।
সেদিনে কি হলো, মতি কে হরিল,
না গণিনু কিছু মনে,
ছিছি মোর হিয়া, না গেল ফাটিয়া
তোমাকে পাঠায়ে বনে।
ডুবি মরি জলে, কাতি দিয়া গলে,
বিষ খেয়ে মরে যাই,
পৃথিবী কাটিয়ে, তাতে প্রবেশিয়ে,
তবু মুখ না দেখাই।
জটা কি এ কেশে, এ মোহন বেশে
বাকল বসন সাজে ?
কৈকেয়ী চণ্ডালী, কলঙ্কের ডালি,
ধরয়ে এ মহী মাঝে।
শুন ঘনশ্যাম, বল দেখি রাম,
কি হবে উপায় মোর ?
পড়িনু পাথারে, কে তরাবে মোরে ?
স্মরণ লইনু তোর।
কৈকেয়ী সম্বোধি, কন কৃপানিধি,
হৃদেতে না কর খেদ,
শুন মন দিয়া, বলি বিবরিয়া,
পরম নিগূঢ় ভেদ।
তব চিত্ত বৃত্ত, আমি জানি নিত্য,
মোর প্রতি শুদ্ধ হিয়া,
তবে যে সেদিন, পাঠালে কানন,
সে বটে আমার মায়া।
নাশিতে ভূভার, লিনু অবতার,
ভকত ত্রাণের লাগি,

সেই সে কারণে, আমি আনু বনে,
তুমি কিসে দোষ ভাগী ?
আমার মায়াতে, এই সে ভারতে,
ভ্রময়ে যতেক প্রাণী,
কারণ ব্যতীত, মোর যাতায়াত,
না হয় শুন জননী।
না ভাবিহ মাতা, ত্যজ মনোব্যথা,
কেন কর পরিতাপ।
কলঙ্কী তোমারে, যে বলিবে তারে,
ঘটিবে অশেষ পাপ।
প্রভু মুখে বাণী, কৈকেয়ী তা শুনি,
পুন করে নিবেদন,
অহল্যা পাষাণ, যবে কৈলে ত্রাণ
তখনি জেনেছে মন,
তুমি বেদাতীত, আমি অতি ভীত,
হয়েছি কলঙ্ক ভরে।
অন্যে দোষ দিয়া, সাধ নিজ ক্রিয়া,
একে বুঝিবারে পারে ?
শুন রঘুনাথ, ত্রিজগত তাত,
মোর মনোনীত বাণী,
উদরে আমার, যদি একবার,
নিজে জন্ম চক্রপাণি,
মনের আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ,
তবে সব যায় দূর।
ওচাঁদ বদনে, যদি নিজ গুণে,
মা বলহ একবার।

যাতনা পাইয়া, মনেতে ভাবিয়া,
এবর মাগিনু আমি,
করুণা সাগর, দেব রঘুবর,
কৃপা কর মোরে তুমি।
কৈকেয়ীর বাণী, কৃপানিধি শুনি,
কহেন কোমল স্বরে,
না ভাব অন্তরে, ভবিষ দ্বাপরে,
জন্মিব তব উদরে।
বসুদেব জায়া, দৈবকী বলিয়া,
অভিধান তব হব,
তোমার জঠরে, কৃষ্ণ অবতারে,
অবশ্য জনম নিব।
বলি পুনঃ পুনঃ মন করি শুন,
এ বচন মোর ধর,
কিবা দিবা নিশি, একান্তেতে বসি,
আমার ভাবনা কর।
এই কথা শুনি, ভরত জননী,
অবতীতে নত হৈল,
পরিক্রম করি, শ্রীহরি সঙরি,
অযোধ্যা গমন কৈলা।
জ্যেষ্ঠের আদেশে, জগতবাম ভাষে,
যম ত্রাসে পায়ে ভয়,
হেব বা না হেয়, প্রভু রঘুবর,
তবে হাস্য পাছে হয়।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গীয় লেখক পাঠক ও সমালোচক।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের লেখকেরা রক্ষার ন্যায় যাহা ইচ্ছা অবিরত সৃজন করিতে থাকুন এবং মুদ্রাযন্ত্র ও যাহা ইচ্ছা ইস্পার করিতে থাকুক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কেন না যাহা বাঁচিবার উপযুক্ত স্বভাবের 'Survival of Fittest' নিয়ম অনুসারে তাহা বাঁচিবে, আর অপর সকলে নিধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমরা এ মতের বড় পোষকতা করি না। আগাছাতে স্থান জুড়িয়া বসিলে সুবৃক্ষের স্থান হয় কোথায়? আগাছার দল অধিক হইলে আগাছাই দেশ ছাইয়া ফেলে—সুবৃক্ষ মরিয়া যায়। আর এক কথা এই যে, স্বভাবতঃই সুবৃক্ষকে অনেক যত্নে বাঁচাইতে হয়—আগাছার প্রতি যত্ন না করিলেও তাহা তর তর করিয়া বাড়িয়া উঠে। অতএব সুগাছ কুগাছ নির্ব্বিশেষে রোপণ করিলে কুগাছেরই পোহা বারো দেখিতে পাওয়া যাইবে; আর সুগাছ সকল শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইবে। ছাগল গরুতে খাইতে সুগাছটারই মাথাটা অগ্রে খায়—কুগাছ বাঁচিয়া যায়। তাই আমরা বলি যে, কুগাছের সৃজন একেবারে বন্ধ করা আবশ্যক। যদি কাগজের প্রয়োজন কেহ অনিবার্য্য মনে করেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে, কালে সুবৃক্ষের মধ্য হইতে অনেক কু হইয়া যাইবে, কেবল যাহা উৎপরীক্ষা সু, তাহাই চিরদিন সু থাকিবে।

যে প্রকার দেশের প্রকৃত অবস্থা, তাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের মূল্যটা এত সুলভ হওয়া ভাল নহে। মুদ্রাঙ্কণের মূল্যটা অল্প বলিয়া অনেক বাজে মাল পচোর হইয়া যাইতেছে। গ্রামে গ্রামে খোলাভাটী হইয়া মদ্য সুলভ হওয়াতে যেমন মদ্যপায়ীর দল বাড়িতেছে, তেমনই প্রায় সর্ব্বত্রই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়া মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় অল্প হওয়াতে বিস্তর অসার সামগ্রী দেশমধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় বাহুল্যের আমরা পক্ষপাতী না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া ব্যয় বাহুল্যের অনুমোদন করিতে হইয়াছে। যদি মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য ব্যয় সাপেক্ষ হয়; তাহা হইলে অনেকে পশ্চাৎ ফিরিবে; সুতরাং আগাছার সংখ্যা বাড়িতে পারিবে না। তবে অনেক ভাল সামগ্রীও ব্যয় বাহুল্য ভয়ে পচিয়া যাইবে তাহা জানি; কিন্তু তাহাতে একটা সুবিধা এই যে, ভাল সামগ্রী প্রচারিত হইয়া পচিয়া যাওয়াতে দ্বিবিধ ক্ষতি, আর দপ্তরের মধ্যে কীট দষ্ট হইলে কেবল এই ক্ষতি যে, তাহা কেবলই নষ্ট হইল—মুদ্রাযন্ত্রের হাতে পড়িয়া লেখককে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল না। মুদ্রাযন্ত্রের বাজার গরম

হইলে, অনেক খরিদদার সাময়িক বা সম্বাদপত্রের দিকে ঝুঁকিবেন। এই সকল পত্রের সম্পাদকদিগকেও আমরা বলি যে, প্রচলিত প্রথার বিপরীতে যেন লেখকদিগের উপর কর ধার্য্য হয়—যিনি কর না দিবেন তাঁহার লেখা প্রকাশিত না হয়। তবে সারবান প্রবন্ধাদির পক্ষে অন্য কথা চিরদিনই থাকিবে। অন্য কথা সারবান প্রবন্ধাদির পক্ষে থাকিবে সত্য, কিন্তু বাছাই করিতে পারে এমন সম্পাদক কৈ বড় একটা দেখিতে পাই না। আর বাছাই করিবেন বা কি হইতে?—সকল লেখাই এক খুরে মুড়ান। এদিকে পাঠক অপেক্ষা পত্র সংখ্যা অধিক—ব্যবসাদের খাতিরে, যা তা দিয়া কাগজ পূর্ণ না করিলে চলে কৈ? বস্তুতঃ সারবান সামগ্রী যত, তাহাতে একখানা পত্রও ভাল করিয়া চলে কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই একের স্থানে 'গণৈরপি' বলিয়া গিরি ছেন, তথাপি নূতন মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ধন্য প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তি! ম্যাল্থাসের প্রতিভা, এ শক্তির নিকট হার মানিবে না কেন?

বাঙ্গালার অসার ও অশিক্ষিতব্য বিষয় সকলকে দমন করিবার আর একটী উপায় আমাদিগের বলিবার আছে। বলি কি, বাছা বাছা লোক লইয়া একটা সমিতি করিয়া প্রকাশোপযোগী পুস্তক বা প্রবন্ধাদি মঞ্জুর করাইয়া লইলে কেমন হয়? যদি তাঁহাদিগের উপর শ্রদ্ধা থাকে, তবে যাহা তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত নহে, তাহা অবশ্যই সাধারণে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে না। সুতরাং লেখকগণও তাঁহাদিগের অনভিমতে অধিক ব্যয় বাহুল্য করিয়া পুস্তকাদি প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন না—প্রকাশকগণ যে হইবেন না, তাহাতে ত সন্দেহই নাই। এ প্রস্তাবটা কেমন হইল, যাহারা বাঙ্গালার উন্নতি দেখিতেও করিতে চাহেন, তাঁহারা কি একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিয়া ইহার আন্দোলন করিবেন? না, অনেকের পশার মাটি হইবে, এই আশঙ্কায় বিরত থাকিবেন?

যদি ইহাও না হইয়া উঠে, তবে একটী নিঃস্বার্থ কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের সমিতি করিয়া সেই সমিতি হইতে একখানি সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। যাহা পাঠ্য, সমিতি পাঠককে তাহা দেখাইয়া দিবেন—যাহা অপাঠ্য পাঠক তাহা পাঠ করিতে নিষেধ করিবেন। সকল লেখা এই সমিতি হইতে একবার করিয়া আসিলে গ্রাহকের আর সোণা বাঁধান পিওন ফেরা করিতে হইবে না, খোঁড়া পাখা ঘোড়ার দরে বিকিতে হইবে না। এখন কথা এই যে, সমিতি করেকে?—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? সত্যই কি এমন লোক নাই? না থাকিলে জানিব, বাঙ্গালার উন্নতির আরম্ভ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে, সাময়িক পত্রাদির সম্পাদক নামে, আর এক প্রকার জীব আছেন তাঁহাদিগের সহিত লেখকদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। লেখকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাদার—সম্পাদকেরা মহাজন। লেখকেরা মাথায় করিয়া যাহা আনয়ন করেন—সম্পাদকেরা তাহাই চালান দেন। বাজারে তাঁহাদিগের বড় খাতির (credit)। কিন্তু কিসে যে তাঁহাদিগের এত পশার, এদেশে তাহার ত কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মহাজনের কাছে মাল জমা হয় এবং মহাজন ব্যক্তি-

বেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র পাইকার মাল চালান দিতে পারেন না তাহা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া কি মহাজন যাহা ইচ্ছা তাহাই চালান দিবেন? পচা সড়া এবং অস্বাস্থ্যকর সামগ্রীতে যদি ক্রেতার অসুখ জন্মে, তবে কি তাঁহাদিগের সেই পচা সড়া মালই চালান দেওয়া উচিত? আমরা জানি অনেক সম্পাদক মালটা একবার দেখেনও না—প্রাপ্তিমাত্র চালান দিয়া থাকেন। বাজারে সেই সকল মাল, হয় পড়িয়া পচিয়া উড়িয়া যায়, না হয়, তাহাতে ক্রেতার বদ্‌হজম হইয়া রোগ জন্মাইয়া দেয়। তাই বলি, সম্পাদন কার্য্য কি প্রকার গুরুতর, তাহা অনেকেই বুঝেন না, বুঝিলেও মনোযোগ করেন না। আর বুঝেন না এবং মনোযোগ করেন না বলিয়া পাঠকের অরুচি জন্মিতেছে, রসনা বিগড়াইয়া উঠিতেছে এবং পীড়া হইতেছে—যাঁহারা এ সকলের ভয় করেন তাঁহারা অনাহারে পড়িয়া থাকেন, তথাপি সাহিত্য হাটে পা দেন না। সাধারণের পক্ষে কি প্রকার সামগ্রী প্রয়োজনীয় এবং উপকারী, কি প্রকার সামগ্রীতে লোকের সংশিক্ষা হইতে পারে, কিসে লোকের রুচি ভাল হয়, কোন্ দ্রব্য সহজে জীর্ণ হইতে পারে, এই সকল দেখিয়াই মহাজনের মাল চালান দেওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এই সকল বুঝেন এবং মাল চিনেন তাঁহারই মহাজন হওয়া উচিত। তবে উপযুক্ত মাল হাতে না পড়ে—অধিক মূল্যে ক্রয় করুন। আর যদি তাহাতেও না কুলায় তবে আমরা বলি, মহাজনী পাট তুলিয়া দিয়া সাহিত্য ব্যবসায় না করিয়া একখানা মুদিখানার দোকান করিলে মন্দ হয় না।

আমাদিগের পাঠকেরা তবকারির মধ্যে ওল বিশেষ। দেখিতে শুনিতে তাঁহারা মন্দ নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আস্বাদন যিনি লইয়াছেন তিনিই তাঁহাদিগের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা সকল পাঠকেরই কথা বলিতেছি না, তবে পুস্তক বা পত্রাদি লইয়া মূল্য দেন না বলিয়া, অনেকের একটা নিন্দা আছে। নিন্দাটা প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা বটে নাই—ভিতরে অনেকটা সত্য আছে। ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর এ প্রকার কলঙ্ক বড় সহজ নহে। যাহারা গুরুদক্ষিণার জন্য আপনার প্রাণ দানেও কাতর ছিল না, তাহারা যে আজ এ প্রকার জঘন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এ প্রকার অবস্থার কি কোন গুঢ় কারণ নাই?

পুস্তক বা পত্রাদি এখন শিক্ষার জন্য যত নহে আড়ম্বরের জন্য তাহার অধিক। যাঁহার নামে ডাকযোগে কোন পুস্তক বা পত্রাদি আসে না তিনি এক প্রকার নগণ্য। কিন্তু সে সকল পুস্তক ও পত্রাদির গতি হয় কি?—যেমন আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া আসে তেমনই থাকিয়া পচিয়া যায়। আর যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, তাহার মূল্য প্রদানও কর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না।

সর্ব্বত্রই দেখা যায়, লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর চিরবিবাদ। যাঁহাদিগের প্রতি সরস্বতী মাতার অনুগ্রহ একটু থাকে, লক্ষ্মী তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত। সুতরাং পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে গ্রাহক হইতে পারেন না। যাঁহারা সাহস করিয়া গ্রাহক হন, তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়েন। খরিদদার নাস্তান

হইলে বিক্রেতা কয় দিন বাঁচে? অতএব আহারাভাবে অনেক বড় বড় বিক্রেতাকে এ পাট তুলিতে হইতেছে। অন্নবস্ত্রের জন্যই সরস্বতীর কৃপাপাত্রেরা ব্যাকুল, তাহাতে আবার মনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান—কাজেই তাঁহারা নাচার হইয়া পড়েন। অগত্যা পুস্তকরাশি দোকানে পড়িয়া পচিতে থাকে এবং সংবাদ পত্রাদি সকল বেনের দোকান নামে যে মহাতীর্থ আছে, সেই স্থানে গমন করে, আর তাহার সহিত অনেকের আশা, ভরসা, উচ্চাভিলাষ এবং পরিবারের গহনাদি জন্মের শোধ মুক্তিলাভ করে।

পাঠ করা, আমাদিগের বড় একটা অভ্যাস নাই। বিদ্যালয় ত্যাগ করিলে যে আর ও সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়, তাহা আমরা এক প্রকার জানি না বলিলেই চলে। আমরা এক এক জন দিগ্‌গজ বা বহুবিশেষ—আমাদিগের আবার শিখিবার কি আছে? সংসারে প্রবেশ করিলে কেবল ধনমানই উপার্জ্জনের চেষ্টা করিব—পড়া শুনা আবার কেন? বৃদ্ধ হইলে তখন একখানা শ্রীমদ্ভাগবৎ না হয় কেনা যাইবে। এই ত আমাদিগের পেটের কথা—সুতরাং বঙ্গে আবার পাঠক মিলিবে কোথা হইতে? কিন্তু আমরা জানি না যে, আহার দ্বারা শরীর পোষণ যেমন আবশ্যক, সৎশিক্ষার দ্বারা মনের উন্নতি, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। যেদিন দেখিব, বাঙ্গালী চাউল ক্রয় করিতে বাজারে গিয়া, একখানা নূতন গ্রন্থ উঠিয়াছে শুনিয়া, চাউলের পরিবর্ত্তে সেই গ্রন্থখানা কিনিয়া আনিতে শিখিল, সেইদিন জানিব, বঙ্গে যথার্থ বিজ্ঞ লোকের জন্ম হইল। সেই দিন জানিব, বাঙ্গালী পাঠক হওয়াতে কত সুখ, তাহা বুঝিল।

কি পাঠ করিতে হয়, কি শিক্ষা করিতে হয় এবং কি প্রকার শিক্ষা আমাদিগের উপযুক্ত, তাহা আমরা জানি না। এদিকে আমাদিগের গুরু বিস্তর—আমরা পাঠক অবস্থায় শ্যাম রাখিব কি কুল রাখিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। তাহার উপর, আমরা হুজুগে জাতি—যেদিকে খুব হুজুগ দেখি, অধিক আড়ম্বর দেখি, নানাবিধ রং চং দেখি, আমরা আগেই সেইদিকে ঝুঁকি। অধিকন্তু, আমরা নাম খুঁজি—সামগ্রীটার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখি না। ইহার ফল কি হয়?—আমরা কাজে কিছুই করিতে পারি না, যাহা আমাদিগের উপযুক্ত নহে, তাহা পড়িয়া কিছুই সার গ্রহণ করিতে পারি না, সুতরাং ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

তাহার পর আমাদিগের সমালোচক মহাশয়েরা প্রায়ই 'জল উচ্চ' দলের লোক। তাঁহারা পথ দেখাইয়া না দিয়া, বরং অনেক সময়ে, কুপথে লইয়া যান। সাহিত্য ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ সমালোচক মহাশয়েরা প্রায়ই 'গা চাটাচাটি' করিয়া পরস্পর পরস্পরের পসার বজায় রাখিয়া যান। কি একখানা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কোন স্থানে দুইজন চিকিৎসক ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু কাহারও পশার হয় না। ভাগ্যক্রমে একজন একটী রোগী পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়া বলেন যে, এ রোগে তাঁহাকে আনা অপেক্ষা অন্যতমকে ডাকিলে ভাল হইত। রোগীর আত্মীয়েরা পরদিন হইতে দ্বিতীয় চিকিৎসককে রোগী দেখাইতে লাগিল। সৌভাগ্যযোগে দ্বিতীয়

ব্যক্তি একটি রোগী পাইয়া আবার এই প্রকরণ দেখাইলে, রোগীর আত্মীয়েরা প্রথম ব্যক্তিকে নিযোগ করিল। এই প্রকারে পরস্পরে পরস্পরের গুণকীর্ত্তন করাতে শীঘ্রই উভয়েরই পশার জন্মিয়া গেল। আমাদিগের বঙ্গীয় সমালোচক মহাশয়েরা ঠিক্ সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অনেক মহাত্মা খাতিরে পড়িয়া আপনার গুরুভাবের কথা ভুলিয়া, রামকে শ্যাম বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। আর আমরা পরের মুখে ঝাল খাই বলিয়া রামকে শ্যাম বলিয়াই মানিয়া লই। ছি! ছি! সমালোচক মহাশয়েরা মিথ্যা সাক্ষীর চোদ্দ পুরুষান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের নামে কলঙ্ক ঢালিতে ও দেশের মাথায় পা দিতে বসিয়াছেন। সত্যবাদিতা তাহারা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া কেমন করিয়া এই উচ্চ আসনলোভী হইয়াছেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। যদি ন্যায়, সত্য, সভ্যতা, শিষ্টাচার, দেশীয় সাহিত্য, দেশের উন্নতি, এ সকল তাহাদিগের কিছুই লক্ষ্য হইল না, তবে কেন তাঁহারা আদালতের বৃক্ষতলে গিয়া বসুন না। সেখানে বিলক্ষণ দুই পয়সা পাইবার সম্ভাবনা আছে।

উপযুক্ত সমালোচকের অভাবে অনেক ঘোড়া গাদা হইয়া গেল, অনেক পিত্তল সোণা হইয়া গেল। সমালোচকের দোষে অনেক লোকের মাথা খাওয়া হইতেছে—লেখক এবং পাঠক উভয়েরই। পটলকে কচু বলিয়া চালাইয়া দেওয়াতে পটল বিক্রেতার ক্ষতি হইল—আবার যাহার পটলের প্রয়োজন, সে পটল পাইল না এবং যাহার কচুর প্রয়োজন সে পয়সা দিয়া পটল ক্রয় করিয়া তাহাতে কচুর ফল পাইল না। তাই বলি, ভাই উৎকোচ ভোজী অনুপযুক্ত সমালোচের দল! তোমরা পথ ছাড়িয়া দাও, ন্যায়পরায়ণ উপযুক্ত লোক আসিয়া তোমাদিগের স্থান অধিকার করুন। তোমাদিগের ব্যবসায়ের মত ব্যবসায়, ইহা স্থান নহে—এখানে বিদ্যা, বুদ্ধি, দেশহিতৈষিতা, সত্য, ন্যায়পরতা, ধর্ম্মভয় প্রভৃতি অনেকগুলি মহৎ গুণের প্রয়োজন। এ সকল যাহাদিগের আছে, তাহারাই যথার্থ এ পথে আসিয়াছেন—অন্য সকলে, অর্থ লোভী ও নীচাশয়, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের পরম শত্রু।

শ্রীসিঃ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহেন্দ্রনাথ রায়।

কলিকাতায় সিটী কালেজ গৃহে গত ৬ই মাঘ মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সভায় রামমোহন রায় মহাশয়ের যশোঘোষণার উদ্দেশে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরে অবিকল সেই প্রবন্ধটি মাঘ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভা স্থলে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত প্রবন্ধ স্বকর্ণে শুনেন ও ভারতীতে বাহির হইলে স্বচক্ষে তাহা পাঠ করেন। সভাস্থলেই তাঁহার উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বড়ই ইচ্ছা হয় কিন্তু তাঁহার কোন বন্ধু সে কার্য্য সম্পন্ন করায় তিনি তাহাতে নিরস্ত হন, পরে ভারতীতে তাহা পড়িয়া তাঁহার মনে হয় "যখন প্রতিবাদের পরেও কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই—তখন কোন সাময়িকপত্রে প্রকাশ্যভাবে উহার দোষগুণের বিচার হওয়া আবশ্যক।" এই কারণে মহেন্দ্র বাবু 'ভারতী' পত্রিকায় প্রচারিত শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রামমোহন রায়' প্রস্তাবের একটি সমালোচনা ফাল্গুন মাসের 'প্রবাহ' নামক পত্রিকায় করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের শেষ কয় পংক্তি এই—

'কর্ত্তব্যের অনুরোধে এস্থলে বলা আবশ্যক যে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের স্থানে স্থানে অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ রচনা আছে, কিন্তু ত্রুটি প্রদর্শন করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, সুতরাং তদুদ্ধৃতাংশগুলি উদ্ধৃত হইল না।'

মহেন্দ্র বাবু প্রথমে রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের দোষ ও গুণ উভয়ই প্রকাশ্যভাবে বিচার করা আবশ্যক বোধ করেন, লিখিয়া শেষ করিবার সময় তিনি আপনার কথা ভুলিয়া গিয়া বলিলেন 'ত্রুটি প্রদর্শন করাই তাঁহার এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।' এরূপ আত্মবিস্মৃতি মহেন্দ্র বাবু দোষের কথা না ভাবিতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি প্রস্তাবের উপক্রমণিকাতেই বলিয়া দিতেন যে 'ত্রুটি প্রদর্শন করাই' তাঁহার লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহার বেচারা পাঠকদের অনেক উপকার হইত। তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব না পড়িয়াও তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া সে প্রস্তাব পড়িব কি না সাতবার ভাবিতাম। এখন পড়িয়া ফেলিয়াছি আর উপায় কি?

রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ হইতে দ্বীপান্তর করাই মহেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত 'চার্জ' গুলি উপস্থিত করা হইয়াছে।

১। রবীন্দ্রনাথ ভাব চোর। তিনি 'দুষ্প্রবৃত্তি' বশতঃ অক্ষকুমার দত্তের ভাব চুরি করিয়া আপন প্রস্তাব লিখিয়াছেন।

২। রবীন্দ্রনাথ কীর্ত্তিনাশা। তিনি চতুরতাপূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত রামমোহন রায়ের নাম লোপ করিতে উদ্যত।

৩। রবীন্দ্রনাথ মহা মূর্খ। তিনি বঙ্গভাষার কিছুমাত্র জানেন না। পাঠশালার

ছাত্ররাও যে সন্ধি ব্যাকরণ জানে তিনি তাহাও জানেন না। অতএব এ প্রকার ব্যক্তিকে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আর স্থান দান করিলে 'বঙ্গদেশের অবস্থাও অতিশয় হীন ও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া যাইবে।'

(টীকা) আমরা এই প্রস্তাবে যেখানে যেখানে উদ্ধৃতের চিহ্ন দিলাম সেখানে সেগুলি মহেন্দ্রবাবুর নিজের কথা, আমাদের নয়।)

এখন ইন্দ্রদেব মোকদ্দমার এই ইস্যুগুলি ধার্য্য দেখিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে বুঝি ছোকরা রবি নিজের অর্ব্বাচীনতা দোষে মারা পড়ে। তাহার আর হাত কি? পাঠকবৃন্দ আপনারা সুবিচারক। কিছুমাত্র পক্ষাপক্ষ না করিয়া আপনাদের রায় প্রকাশ করুন। যদি রায় মহাশয়ের রাগের সহিত আপনাদের রায় মিলে, রবিকে দূর করিয়া দিন।

প্রথম চার্জ, রবি ভাবচোর। রবি লিখিয়াছে 'দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে (রাম মোহন রায়কে) রাজোপাধি দিয়াছেন, কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গ সমাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।'

ঠিক এই ভাবটী অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ২য়ভাগ উপক্রমণিকার ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠায় আছে। যথা 'তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার নয়। তুমি একটী সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা।'

এখন বিচার্য্য যে এই ভাবরত্নটী এত মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য কি না, যে উহা দত্ত ও রবি উভয়ের ভাণ্ডারে থাকা অসম্ভব এবং রবি উহা আপন ভাণ্ডারে না দেখিয়া দস্যুবৃত্তিপূর্ব্বক দত্ত মহাশয়ের ভাণ্ডার হইতে অপহরণ করিয়াছে। ভাবটীর মূল একটী শব্দ—'রাজা,' ইহা হইতেই রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট ভাব উৎপন্ন। পাঠক বিচার করুন, এ ভাবটী কি এত মহামূল্য যে, যে হৃদয়সাগর হইতে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও শৈশব সঙ্গীতের বহুমূল্য রত্নরাজী উঠিয়াছে, তাহাতে ইহার স্থান হয় না? এ প্রকার রত্ন গোবিন্দ অধিকারী আদি অনেক যাত্রাওয়ালার ও দাশরথী প্রভৃতি পাঁচালী ওয়ালার পেটীকার ভিতর বিস্তর পাওয়া যায়। তজ্জন্য বেচারা রবীন্দ্রকে চোর বলা কিরূপ প্রকৃতির কার্য্য ভদ্রলোকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। দুইজনের দুইটী দ্রব্যের সাদৃশ্য থাকিলেই যদি একে অপরকে চোর বলিতে পারে তাহা হইলে ঘরকন্না করা ভার। আমার ও তোমার উভয়েরই অনামিকা উভয়েরই কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর অব্যবহিত পরে ও দেখিতেও এক প্রকার, অতএব আমি যদি বলি তুমি আমার অনামিকা চুরি করিয়াছ, তুমি আঙুল চোর, তাহা হইলে কথাটা কিরূপ হয়?

নথি বেড়ে যায় বলিয়া অভিযোগের প্রমাণ অপর বামালগুলি উল্লেখ করা গেল না। সেগুলিতেও এই প্রকার। অতএব সুবোধ পাঠকের পক্ষে একটীই যথার্থ।

দ্বিতীয় চার্জ। রবী বাবু রামমোহন রায়কে উৎসব দিবসে তাঁহারই সম্মানার্থ আহূত সভাস্থলে তাঁহাকেই গালি দিয়াছেন। রামমোহন রায়কে অনুদার বলিয়াছেন। এটী হরমুতের দাবী। সকলে শুনুন রবীন্দ্রবাবু কি বলিয়াছেন এবং মহেন্দ্র বাবু

বা কি বুঝিয়াছেন। রবী বাবু মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়কে কার্য্যবীর ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপক বর্ণনা করিয়া কেবল বিদ্বেষীদের আপত্তি খণ্ডনার্থ নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন।

'এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়ত দুই একটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার প্রয়োজন কি? তিনি এত ভাষা জানিতেন এবং ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্ম্মের সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল—তিনি ত বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্ম্মাদি আহরণ করিতে পারিতেন, তবে কেন তিনি সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য সকল ধর্ম্ম ফেলিয়া ভারতবর্ষেরই ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান দর্শনের ন্যায় ইত্যাদি।'

মহেন্দ্র বাবু 'প্রতিষ্ঠিত করিলেন' পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার অব্যবহিত পরেই যে 'তাহার উত্তর এই' কথাগুলি আছে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন না এই তিনটী শব্দ দিলেই সামান্য পাঠকও বুঝিতে পারিতেন যে রবীবাবু যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, সে প্রশ্ন তাঁহার নিজের নহে; সে প্রশ্ন রামমোহন রায়ের বিদ্বেষী পক্ষের। তিনি কেবল তাহা খণ্ডন করিবার জন্যই তাহার উত্থাপন করিয়াছেন। এখন এই তর্ক একা রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে তর্ক নহে, ইহাতে রবী বাবু ও মহেন্দ্র বাবুরও উদারতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিরপেক্ষ পাঠক বিচার করিয়া দেখুন অনুদারতা কাহার? খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে বাইবেলের এক স্থানে আছে 'The fool hath said in his heart that 'There is no God' যদি কেহ এই বাক্য লইয়া তর্ক করিয়া বলে, 'It is said in the Bible that there is no God' অর্থাৎ বাইবেলে লেখা আছে ঈশ্বর নাই—তাহা হইলে সে তার্কিককে লোকে কি মনে করে? ফলকথা মহেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য রবীবাবুকে গালি দিয়া আপনার নাম অমর করিবেন। তাই ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকৃত কথা গোপন করিয়া আকাশে চুল জড়াইয়া রবী বাবুর সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত। ইংলণ্ডে একজন সেণ্টপল নামক জগদ্বিখ্যাত গির্জ্জা পোড়াইয়া নিজের নাম অমর করিয়া গিয়াছে। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা সপ্রমাণ করিতে আমাদের রায় বাগীশ কতই না নজীর দেখাইতেছেন! আরে বাপু নজীরের প্রয়োজন কি? রামমোহন রায়কে অনুদার বলিল কে যে তুমি তাহা অপ্রমাণ করিবার জন্য এত মাথা খুনাখুনি করিতেছ? সমস্তটা প'ড়ে, লেখকের ভাব বুঝিতে চেষ্টা কর—নিজে না বুঝিতে পার কাহারও নিকট বলিয়া লও। মিছামিছি গোল কর কেন? তবে যদি অপূর্ব্বকে অকারণে গালি দেওয়া তোমার চিরাভ্যস্থ স্বভাব হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই সম্বন্ধে একটা হাঁসির গল্প মনে পড়িল বলিয়া রাখি। কোন স্থানে এক বিশ্ব-নিন্দুক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার স্বভাব সকলের সকল কার্য্যে দোষ বাহির করা। ক্ষমতা কিছুমাত্র ছিল না—প্রায়ই পরান্নে উদরপূর্ত্তি করিত, কিন্তু যাহার বাড়ী যেদিন খাইত তাহার খাদ্যদ্রব্যের দোষ

ধরিত। এ ব্যঞ্জনে লবণ বেশী হইয়াছে, ওটাতে লবণ কম হইয়াছে ইত্যাদি। একদিন কোন মহাশয় যথেষ্ট পরিপাটীরূপে উদ্যোগ করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যে ব্যক্তিকে খাওয়াইবার জন্য এত ঘটা এত উদ্যোগ, তাহাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুর বাসিনীগণ অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ চব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়, গণ্ডে মুণ্ডে খাইয়া উঠিয়া যায়, গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মহাশয় কেমন হইয়াছে? উত্তর—সব ভাল কিন্তু বড় উঁকি ঝুঁকি। মহেন্দ্রবাবুর দোষ খুঁজিয়া বাহির করাও এইরূপ।

আমাদের এদিকে পুথি বেড়ে গেল। এখন তৃতীয় চার্জ। সে চার্জ এই।

৩য়। রবীন্দ্র বাবু মূর্খ—তিনি ভাষাও জানেন না—ব্যাকরণও জানেন না। এই চার্জ্জ স্থাপন করিবার জন্য একটী দুটী নয় দশটী দশটী সাক্ষী খাড়া করা হইয়াছে। আমাদের এত সময়ও নাই সহিষ্ণুতাও নাই যে সকল গুলির তন্ন তন্ন বিচার করিয়া দেখাইয়া দিই। দুই একটীর উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইব।

রবী বাবু লিখিয়াছেন।

১। 'সমস্ত জীবন দৈনন্দীন খুটি নাটির মধ্যে সমাহিত হইয়া অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণতার গর্ভে স্বচ্ছন্দ সুখ অনুভব করি।

২। 'আমরা যে আধাদের চেয়ে চের বড়' ইত্যাদি—

৩। তখন কাজেতে মত্ততা সুখ ছিল না, অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইবার—হাঁস ফাঁস করিবার আনন্দ ছিল না।'

মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন 'ইত্যাদিস্থলে 'খুঁটি নাটি' 'চেয়ে', 'চের', 'হাঁস ফাঁস,' প্রভৃতি শব্দ কেমন মনোহরভাবে বিরাজ করিতেছেন। আহা। ওগুলি কি সুশ্রাব্যই হইয়াছে। আবৃত্তিমাত্রেই যেন প্রাণ শীতল হইয়া যায়।' যাহা হউক মেনে মহেন্দ্র বাবু ভাষার খুব রসগ্রাহী। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি যাহা বুঝিতে পারেন না অপরকে তাহাই লইয়া গালি দেন। রবীন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য ঐ সকল স্থলে শ্রোতাও পাঠকের মনে আপন আপন মনুষ্যত্ব প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিয়া দেওয়া, সেই জন্যই স্বভাবতঃ তাঁহার লেখনী মুখে ঐ সকল তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক গ্রাম্য অল্প প্রাণ শব্দ অপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে। এমন স্থলে রবী বাবু যদি সুদীর্ঘ সংযুক্ত সমস্ত পদ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইত। করিবর পোপ তাঁহার সমালোচনা প্রবন্ধে বলিয়াছেন, বচনায় শব্দগুলি কেবল শ্রুতি মধুর হইলে চলিবে না, 'The sound must be an echo to the sense' অর্থাৎ যেমন ভাব তদ্ব্যঞ্জক শব্দগুলির উচ্চারণও তদনুরূপ হওয়া চাই। কিন্তু আমাদের রবী পীড়ক সমালোচকের নিকট এইগুলি দোষাবহ হইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বাবু। প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল; অধিক লিখিবার ইচ্ছাও নাই। তবে আপনার প্রতি একটী কথা। আপনি যতই কেন চেষ্টা করুন না—রবীর কীর্ত্তি ছটা কখনই গ্রাস করিতে পারিবেন না, কখনই তাহাতে ছায়ামাত্রও পড়িবে না ও আপনি ওপ্রকারে প্রবাহ মধ্যে নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাহা কালসাগরে কোথায় ভাসিয়া যাইবে চিহ্নমাত্রও রহিবে না।

শ্রীশিঃ—

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচন।

'বিধিব প্রবন্ধ' প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। সিংহ এণ্ড বেনরজি ফ্রেণ্ডস্ কর্তৃক ওরিয়েণ্ট্যাল পবলিশিং এষ্ট্যাবলিশমেণ্ট হইতে প্রকাশিত এবং ১৮৭ নং কর্ণযোলালিস ষ্ট্রীট কবপ্রেসে মুদ্রিত। পুস্তকখানি গ্রন্থকর্ত্তাব পূর্ব্বলিখিত এবং প্রকাশিত কতকগুলি সামাজিক প্রবন্ধেব সঙ্কলন মাত্র। এই প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই অতি সুপাঠ্য এবং গভীব চিন্তা এবং উপদেশ পূর্ণ। সাধাবণ পাঠকবর্গ এই পুস্তকখানি পাঠ কবিলে আমাদেব দেশেব পুবাতন এবং নূতন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধীয় অনেক কথা অবগত হইতে পাবিবেন।

'অদৃশ্য দর্শন কাব্য'—শ্রীযুক্ত বিজব কেশব বসু প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস দত্ত কর্তৃক গোযাবাগান ৩নং 'অবোবা' প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থেব প্রকাশক পুস্তকখানির বড় প্রশংসা করিযা ইহাতে একটি বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে 'সুবিচাবক গুণগ্রাহীগণ যে গুণে ও যে ন্যায়চক্ষে সুবিচারক আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন সেই গুণে ও সেই চক্ষে এই বর্ণচোরা আম্রের মত 'অদৃশ্য দর্শন'কেও দর্শন করুন।'আমরা সেইরূপেই পুস্তকখানিকে দর্শন করিয়াছি। পুণ্যাত্মাদিগের স্বর্গভোগ এবং পাপীদিগের নরক ভোগ ইত্যাদি বিষয় ইহাতে পদ্যে কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রচনা বেশ সহজ সুমিষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী। এক বকম উচ্চদবেব পদ্য আছে যাহা পাঠ কবিতে কবিতে পাঠকেব মন প্রাণ উচ্ছ্বাসিত এবং দেঁহ বোমাঞ্চিত হইযা উঠে—ইহাব পদ্য তত উচ্চদবেব নহে, কিন্তু তথাপি আমবা বলিতে পাবি, ইহা পাঠ করিযা কেহ প্রীত ভিন্ন অপ্রীত হইবেন না।

'শোভনা'—প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত হবিদাস ভাবতী প্রণীত, এবং ২১০।১ কর্ণওযালিস ষ্ট্রীট ভিক্টোবিযা প্রেসে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ দ্বাবা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শোভনা একখানি বাজনৈতিক নবন্যাস। গ্রন্থকর্ত্তা ইহাব নামকবণে এইরূপ লিখিযাছেন—'শোভনা' অথবা 'ভবিষ্য ইতিহাসেব একটি অধ্যায়।' বিদেশীয শাসন হইতে স্বদেশকে স্বাধীন কবিতে হইলে আমাদেব জাতীয চবিত্র এবং আচবণ কিরূপ হওযা উচিত, একটি উপন্যাস ছলে গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই নির্দ্দেশ কবিযাছেন। গ্রন্থকর্ত্তাব উদ্যম অতি প্রশংসনীয এবং তাঁহাব পুস্তকেব প্রাবম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেশেব মঙ্গলের জন্য যে এক অকৃত্রিম আগ্রহাতিশয প্রকাশ কবিয়াছেন তাহাও বড প্রীতিকর; কিন্তু উপন্যাস বচনা কৌশলে তিনি আমাদের বিবেচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, যখন তাঁহার পুস্তক এখনও শেষ হয় নাই—কেবল প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আমরা ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে একটা স্থির অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিনা।

'নারীনীতি'—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত এবং ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানি অতি উত্তম নীতিগর্ভ পুস্তক। স্ত্রীচরিত্র কিরূপ গঠিত হওয়া উচিত এবং ইহাতে কি কি সৌন্দর্য্য থাকা উচিত তাহা ইহাতে সবিস্তারে উপদেশ ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি পুস্তকের লেখক একজন সুবিজ্ঞ প্রবীন লোক, তাঁহার গম্ভীর নীতিপূর্ণ উপদেশগুলি স্থির ভাবে পাঠ করিলে বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। বঙ্গসমাজের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃতা হইবেন। পুস্তকখানির সমস্তই ভাল—নিখুঁত, কেবল যদি ভাষাটা আর একটু সরল এবং সহজ বোধ্য (স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী) হইত।

'স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ'—ঐ ঐ। এখানিও উপরোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। এখানিতে কয়েকখানি পত্রের দ্বারায় স্ত্রীদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

'কয়েকখানি পত্র ও উত্তর'—শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় প্রণীত এবং ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যাবত্নকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এ পুস্তকখানিও স্ত্রীদিগের পঠনোদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রী উভয়ে পরস্পরকে পত্র এবং তাহার উত্তর লিখিতেছেন এবং তাহারই মধ্যে গ্রন্থকর্ত্তা স্ত্রীদিগের প্রতি অনেকগুলি উপদেশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা নব্য সম্প্রদায়ের লোক, সুতরাং নব্য প্রণালীতেই তিনি স্বামী স্ত্রীর পত্র এবং তাহার প্রত্যুত্তর রচনা করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহার পুস্তক আজ কালের দিনে বিশেষ আদরণীয় হইবে। যে পত্রাদির প্রারম্ভে 'প্রাণনাথ!' কিম্বা 'প্রিয়তমে!' প্রভৃতি সুমিষ্ট বাক্য সন্নিবেশিত থাকে, তাহার পাঠক অগননীয়। যাহা হউক পুস্তকখানি অতি উত্তম এবং সুরুচিসম্পন্ন এবং এতদ্বারা আমাদের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

'আমার চিন্তা'—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত এবং ডাইরেক্টরী যন্ত্রে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানিতে গ্রন্থকর্ত্তার কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবিষয়ীক চিন্তা সৎই হইয়া থাকে; তবে ব্যক্তিবিশেষে চিন্তার গভীরতার তারতম্য হয়। আমাদের গ্রন্থকর্ত্তার চিন্তা খুব গভীর এবং উচ্চদরের তাহা বলিতে পারি না, তবে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের প্রীত ভিন্ন অপ্রীত হইবার সম্ভাবনা নাই।

'সুধারাম'—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত এবং ১৬৭ নং বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কর প্রেসে শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড় প্রীতিকর। সুধারামের চরিত্রটি অল্পের মধ্যে অতি চমৎকাররূপে চিত্রিত হইয়াছে। দেখিলাম গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থখানি মাজিষ্ট্রেট মিঃ বকলাণ্ড সাহেবকে 'as a token of submisson' উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার সঙ্গে বকলাণ্ড সাহেবের কি সম্বন্ধ তাহা জানি না; কিন্তু পুস্তক লিখিয়াও যদি 'submission'

দেখাইতে হয়, তাহা হইলে ত আর বাচি না!

'নির্ব্বাণ জীবন'—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত, ও ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানি একটি ক্ষুদ্র কবিতা—ইংরাজী কবি গ্রের বিখ্যাত 'এলিজি'র ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। রচনা উত্তম হইয়াছে—পাঠ করিতে করিতে হৃদয়মধ্যে বাস্তবিকই কবির অভিপ্রেত ভাবের উদয় হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, যিনিই এই পদ্যটি পাঠ করিবেন তিনিই সন্তুষ্ট হইবেন।

উপরোক্ত ভিন্ন আমরা আরও কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি যথা—

'বসন্তকুমারী' নাটক শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর প্রণীত,

'হাসবে পয়সা' নাটক (লেখকের নাম নাই),

'একে বলি কি?' নাটক 'আমিতো উন্মাদিনী' প্রণেতা প্রণীত,

'আমিতো উন্মাদিনী' নাটক—শ্রীশ্রীনাথ চৌধুরী প্রণীত,

'বীরবালা' নাটক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত;

'মহারাষ্ট্র বন্ধু' নাটক　　ঐ

'হেমনলিনী' নাটক　　ঐ

কিন্তু এই পুস্তকগুলি সমালোচনার উপযুক্ত নহে। এগুলি লিখিত এবং প্রকাশিত না হইলে বঙ্গসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, বরঞ্চ বোধ করি উপকারই হইত।

মাস সমালোচন।

—***—

বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের এখনও হ্রাস নাই—দিন দিন লোকের কষ্ট বৃদ্ধিই হইতেছে। সাধারণ চাঁদা সংগ্রহের দ্বারা যতদূর সম্ভব ততদূর সাহায্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হইতেছে না, অনাহার মৃত্যুর সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার হাত গুটাইয়াছেন, দুঃখীর আর্ত্তনাদ কিম্বা সহানুভূতিকারীদের অনুনয়—কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিতেছেন না। একবার মন্তব্য প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা সামান্য মাত্র; ছোটলাট বাহাদুর এইরূপ বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার

অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও সেই ধুয়া ধরিয়াছেন। এদিকে অনেক সম্বাদপত্রে অনেক স্বাধীন ভদ্রলোক স্বচক্ষে লোকের কষ্ট দর্শন করিয়া তাহা প্রচার করিতেছেন; কিন্তু তাহা শুনে কে? গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর—অন্যে কিছু বলিলে তাহাতে ফল কি হইবে? দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্নকষ্ট সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থা। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, শুনিতেছি, তথাকার সহৃদয় কলেক্টর সাহেব বাহাদুর ভবসা করিয়া এপর্য্যন্ত তাহার একটি পয়সাও খরচ করিতে পারেন নাই!

গবর্ণমেণ্টের কলিকাতীয় 'সিসন্' শেষ হইয়া আসিয়াছে, এদিকে গ্রীষ্মও উপস্থিত, সুতরাং লাটসাহেব বাহাদুর এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ সদলবলে এক্ষণে সীমলা শৈলে যাত্রা করিতে উদ্যত। সাহেব মহলে খুব তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে, সকলে আপনাপন জিনিষ প্যাক করিতেছেন, আর ওদিকে দিনান্তে ২।৪ ঘণ্টা মাদ্রাজ অফিসে গিয়া যাহা কিছু কর্ম্ম কায হস্তে আছে তাহা যেনতেন প্রকারেন 'ডিসপোজ অফ' করিতেছেন। সে কাউন্সিল লাট সাহেব বাহাদুর ও স্বয়ং বড় কম ব্যস্ত নহেন, দুইটি বড় উচ্চদরের কর্ম্ম তাঁহার হস্তে ছিল—বেণ্টবিল এবং আগামী বৎসরের বজেট, এ দুইটিই তিনি শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। বেণ্টবিল পাশ হইয়াছে, বজেট ও গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

বেণ্টবিল শেষে যে আকারে পাশ হইল তাহাতে না প্রজা না জমীদার কেহই সন্তুষ্ট হইল না। জমীদারেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তবু অনেক কথায় আপনার 'কোট' এবং স্বার্থ বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু শুনিতেছি, তাহাতেও তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিবেন। পরামর্শ খুব ভাল, দেখা যাউক, শেষ ফল কি হয়।

বড় বড় ইংরাজী এবং দেশী সম্বাদ পত্র ওয়ালারা লর্ড ডফ্রিনকে নিন্দা করিতেছেন,—বলিতেছেন যে লাট সাহেব বাহাদুর সাধারণ মত তাচ্ছিল্য করিয়া অন্যথা তাড়াতাড়ির সহিত এই আইন পাশ করিলেন। আমরা কিন্তু এই অভিযোগে মত দিতে অক্ষম। বেণ্টবিলের কথা আজ ৩।৪ বৎসর হইতে হইয়া আসিতেছে, ইতিমধ্যে অনেকবার তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বারম্বার আন্দোলন এবং তর্ক বিতর্কের ফলে ইহাতে সময়ে সময়ে বিস্তর পরিবর্ত্তন ও করা হইয়াছিল। গত বৎসরই ইহা পাশ হইবার কথা ছিল, কিন্তু জমীদারদিগের প্রার্থনাতে আর এক বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছিল। এমন অবস্থায় কি করিয়া বলা যায় যে এ বৎসর ইহা পাশ করিয়া লর্ড ডফ্রিন অথথা তাড়াতাড়ি করিয়াছেন। অবশ্য স্বীকার করি যে এখনও ইহাতে অনেক দোষ এবং অসম্পূর্ণতা আছে; কিন্তু বোধ হয় ইহা যেরূপ বৃহৎ ব্যাপার তাহাতে দশ বৎসর কাল তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলেও ইহা একেবারে নির্দ্দোষ হইবে না।

এবারকার বজেটে বিশেষ নূতন কথা কিছু নাই। কোন নূতন টাক্স হইল কি না সেই কথাটাই জানিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া থাকি। এবৎসর তাহা কিছু হইল না; তবে রাজস্বমন্ত্রী কলভিন বাহাদুর ঘুণাক্ষরে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে রৌপ্যমুদ্রার মূল্য ইউরোপীয় বাজারে যেরূপ রোজ রোজ

কন হইয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহার ফলে ভবিষ্যতে আমাদের যে অজস্র লোকসান হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্য হয়ত পরে কোন নূতন বিশেষ টাক্স বসাইতে হইবে। আমাদের দেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত, অন্যান্য দেশে (যাহাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে হয়) তাহা নহে, সুতরাং তাহাদের জিনিষ লইয়া আমরা রৌপ্য মুদ্রায় তাহাদিগকে যে মূল্য প্রদান করিয়া থাকি, তাহারা তাহা হইতে টাকার যাহা খাদএবং বাটা তাহা বাদ দিয়া আসল রৌপ্যের যাহা দাম তাহাই হিসাব করিয়া লয়। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিনিময় ঘটিত এই যে ক্ষতি, ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। দেশের বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান সকল ব্যক্তিরই এই বিষয়টী চিন্তা করা, এবং কিসে ইহা নিবারিত হয় তাহার উপায় স্থির করা উচিত।

গতমাসের মধ্যে আমাদের ছোটলাট বাহাদুর এবং তাঁহার কাউনসিলও খুব কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। এই কাউনসিলে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় আইন 'পেশ' রহিয়াছে। প্রথম স্বায়ত্ব শাসন আইন এবং দ্বিতীয় পাটওয়ারি বিল। স্বায়ত্বশাসন আইন আজ গত দুই বৎসর হইতে 'পেশ' অবস্থাতেই আছে, এইবার নিশ্চিতই বিধিবদ্ধ হইবে। কাউনসিলের বিগত অধিবেশনে ইহার শেষ রিপোর্ট পঠিত এবং বিবেচিত হইয়াছিল; দেশীয় কয়েকজন সভ্যের অনুরোধে ১৫দিন আরও সময় দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সাধারণের অবগতির জন্য আর একবার স্থানীয় গেজেটে প্রকাশিত হইবে; তৎপরে পাশ হইবে। ভারত বর্ষের অপরাপর সমস্ত প্রদেশেই এই আইন পাশ হইয়া গিয়াছে—এবংসব বাঙ্গালার আইনটিও অতি শীঘ্র যাহাতে পাশ হয় আমাদের প্রার্থনা।

পাটওয়ারি বিলটি নূতন—সেদিন নূতন মেম্বর মিঃ ম্যাকডনেল সাহেব কাউনসিলে পেশ করিয়াছেন। রেণ্ট বিলের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা জমীদার সম্বন্ধীয় গ্রাম্য হিসাব রক্ষক পুরাতন পাটোয়ারি প্রথা যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মধ্যে প্রচলিত এবং সংরক্ষিত হয় তাহারই অভিপ্রায়ে এই নূতন আইনটি বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাবনা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বিশ্বাস যে জমীদার নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ সত্য নিষ্ঠার সহিত প্রজাদিগের সঙ্গে হিসাব কিতাব করেন না, তাহারা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত, সুতরাং সর্ব্বদাই তাহাদিগকে জমীদারের অসততার জন্য ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয়। যদি প্রতি গ্রামে গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত এক এক জন পাটোয়ারি থাকে এবং প্রত্যেক প্রজার জমী জমার হিসাব তাহারই হস্তগত হয়, তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে আজকাল প্রজার উপর যতটা অত্যাচার হইয়া থাকে ততটা আর হইতে পারিবে না। এই পাটোয়ারি প্রথা নূতন কথা নহে, বহুকাল হইতে এই প্রথা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে; পাঠোয়ারিরা জমীদারদিগের বেতনভোগী চাকর, কিন্তু প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ীক গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সরকারি চাকর করিতে ইচ্ছা করেন। তাহাদের রাখিবার জন্য যে খরচ হইবে তাহা অবশ্য প্রজা জমীদার উভয়কেই দিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের নিযুক্তি কিম্বা কর্ম্মচ্যুতি বিনা গবর্ণমেণ্টের হুকুমে হইতে পারিবে না। আর তাহারা

গ্রাম্য হিসাব কিতাব সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় জেলার কলেক্টর সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী স্বরূপ কর্ম্ম করিবে। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় যে খুব উত্তম এবং সৎ তাহাতে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না, কিন্তু কথা এই যে ৪।৫ টাকা বেতন ভোগী অশিক্ষিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে গ্রাম্য হিসাবে সততা রক্ষা করিতে পারিবেন আমাদের এরূপ বিশ্বাস নাই। যাহা হউক এই বিলটি কেবল এই মাত্র কাউনসিলে 'পেশ' হইয়াছে, আমাদের অনুরোধ যে সর্ব্বসাধারণ বিশেষ আন্তরিকতার সহিত ইহার আবশ্যকতা কিম্বা অনাবশ্যকতা বিষয়ে বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করিবেন।

গতমাসে পূর্ণিয়াস্থ পুলিস ইনস্‌পেক্টর লালুরাম পাঁড়ের মকদ্দমা লইয়া খুব আন্দোলন চলিয়াছে। একটি বাছুর চুরীর মকদ্দমা লইয়া লালুরাম ওয়াকার নামক একজন নীলকর সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান করেন। এই অপরাধ, পুলিসকর্ত্তৃক এরূপ গ্রেপ্তার বোধ করি সমগ্র ভারতবর্ষে আজ কাল প্রতিদিন সহস্র সহস্র ঘটিতেছে, কিন্তু কালা নেটিভ হইয়া সাহেবকে গ্রেপ্তার করে এ বড় ভয়ানক ব্যাপার! এই জন্য বাঙ্গালা বেহারের সমস্ত নীলকর চাকর এবং সওদাগর সাহেবেরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন, ডিফেন্স আসোসিয়েসনের ক্রোধও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সকলে মিলিয়া ওয়াকারের সানুকূল্যে চাঁদা দিয়া মকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। লালুরামের আবেদনমতে মকদ্দমা পূর্ণিয়ায় না হইয়া মজফরপুরে হয়; তথাকার জজ ব্রেটসাহেব লালুরামকে বেকসুর খালাস দেন। জজ সাহেবের এই অপরাধ বিচারে সাহেব মহলের ক্রোধ আরও বেশী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠায়, তাঁহারা হাইকোর্টে 'মোসন' করেন। শুনা যাইতেছে যে হাইকোর্ট হইতেও লালুরামের অব্যাহতি হইয়াছে।

লালুরাম ব্যক্তি কে, তাহার মোকদ্দমা লইয়া এত গণ্ডগোল কিছুই হইত না, কিন্তু সাহেবেরা এবং ডিফেন্স আসোসিএশন ওয়াকার সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করাতেই মোকদ্দমাটা যেন একটা জাতীয় এবং সম্প্রদায়ীক কলহ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ডিফেন্স আসোসিএশনের এরূপ পক্ষ সমর্থন কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই। সাহেব নেটিভ পরস্পর বিবাদ করিলে যে অপরাধী আইন মত তাহার শাস্তি হইবেই হইবে, কিন্তু রাজ্যের আইনের এবং বিচারকদিগের বিচারের উপর এইরূপ নির্ভর না করিয়া যদি সাহেব কিম্বা দেশী বলিয়াই কেহ কোন বিশেষ পক্ষের সাহায্যকারী হয় তাহা হইলে তাহাতে সমাজ মধ্যে সাম্প্রদায়ীকতা, বিজাতিদ্বেষ প্রভৃতি অতি কদর্য্য এবং ঘৃণার্হ প্রবৃত্তির অবতারণা করা হয়। আমরা বিবেচনা করি ডিফেন্স আসোসিএশন ওয়াকারের পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাই করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্য ভিন্ন যদি ডিফেন্স আসোসিএশনের অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তাহা হইলে যত শীঘ্র তাহা উঠিয়া যায় তাহাই ভাল। আমাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্ট এবং ডিফেন্স আসোসিএশনের উদ্যোগকারীরা উভয়েই এই কথাটা বিবেচনা করিবেন।

সাহেবদের উপরোক্ত আসোসিয়েসন দেখিয়া আমাদের দেশেও দেশীয় লোক-

দিগের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে স্থানে স্থানে নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত মাসের মধ্যে কৃষ্ণনগর এবং যশোহর এই দুই স্থানে দুইটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা খুব ভাল লক্ষণ, আমরা আশা করি অপরাপর বর্দ্ধিষ্ণু স্থানের কৃতবিদ্য স্বদেশহিতৈষী লোকেরাও কৃষ্ণনগর এবং যশোহরের এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবেন।

লাট সাহেব বাহাদুর এক্ষণে তাড়াতাড়ি কলিকাতার কর্ম্মকার্য্য শেষ করিয়া শীঘ্রই পশ্চিমযাত্রা করিবেন। একেবারে সীমলা যাইবেন না, আগামী ২৮শে মার্চ্চ তারিখে রাওলপিণ্ডিতে এক মহতী দরবার হইবে তাহাতেই যাইবেন। মধ্য আসিয়ায় রুশীয়ানেরা আজ কাল বড় গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইতেই কৃতসঙ্কল্প। মধ্যে ত কয়েকদিবস হইল সম্বাদ আসিয়াছিল যে লড়াই আরম্ভ হয়, আর বন্ধ থাকে না। এই সমস্ত কারণে আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও রুশীয়ানদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সেই জন্যই রাওলপিণ্ডিতে একটী মহতী সামরিক দরবার হইবে, কাবুলের আমীর তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, বিংশতি সহস্র সেনা, তদনুযায়ীক তোপ ইত্যাদি তথায় আনীত হইবে এবং লাটসাহেব এবং তাঁহার কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যগণ, পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিমের ছোট লাটেরা, তদ্ভিন্ন শত সহস্র উচ্চ উচ্চ অপর কর্ম্মচারীরা এবং দেশী রাজারাজওয়াড়াও সকলে একত্রিত হইবেন। ৭৫ দিন দরবার হইবে—ধুম কারখানা লাগিবে। অভিপ্রায় কাবুলের আমীরকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে স্বচক্ষে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপ সন্দর্শন করাইবেন—যাহাতে তাঁহার মনের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তিনি ইংরাজ ছাড়িয়া রুশীয়ানের শরণাপন্ন না হয়েন। শুনা যাইতেছে, যে আমীরের সঙ্গে এবার একটা পাকা সন্ধিস্থাপনও হইবে। তাহার অভিপ্রায় এই যে রুশীয়ানদিগের সংস্রবে আমীরের যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক, ভারতবর্ষীয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ধন প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য দান এবং তাঁহার উদ্ধার সাধন করিবেন, কিন্তু পক্ষান্তরে আমীরকে তাঁহার রাজত্বের পররাষ্ট্রবিভাগীয় (Foreign) সকল কার্য্যেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপদেশাধীন থাকিতে হইবে। আমীর অবশ্যই এরূপ সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, কেন না, তাহা না হইলে তিনি স্বয়ং আসিতে প্রস্তুত হইতেন না, আর বিশেষ, ইংরাজেরাই তাঁহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত বরাবর অর্থ এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি দান করিয়া আসিতেছেন, এমন অবস্থায় তিনি অনন্যোপায়। এক্ষণে আমীরকে এরূপে হস্তগত করিয়া যদি আমাদের গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি রুশীয়ানদিগের অগ্রগতি একেবারে রোধ করিতে পারেন তবেই মঙ্গল—আমরা সর্ব্বান্তকরণে ঈশ্বরের নিকট তাহাই প্রার্থনা করি।

রুশীয়ানেরা এক্ষণে হিরাত নগরীর কিছুদূর উত্তরে অবস্থিত; আর না তাহারা অগ্রসর হয়, ইংরাজদিগের তাহাই অভিপ্রেত। তাহাদের অধিকারের সীমা ঠিক কি পর্য্যন্ত হওয়া উচিত তাহাই স্থির করিবার জন্য কয়েক মাস হইল আমাদের গবর্ণ-

মেণ্ট বাউণ্ডারি কমিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত কমিশন সদলবলে এক্ষণে হিরাতের সন্নিকটে বসিয়া আছেন; রুশীয়ানদিগের পক্ষ হইতে কোন লোক অদ্যাপি এখনও আসে নাই, কবে আসিবে তাহারও স্থিরতা নাই। আসল তকরার—হিরাতের উত্তরস্থ টর্কুমান জাতি কর্ত্তৃক অধিবাসিত কতকটা ভূমি খণ্ড লইয়া। রুশীয়ানেরা বলেন যে যখন সমগ্র টর্কুমান জাতি তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে তখন এই অংশটুকুও তাঁহাদের অধীনস্থ হওয়া উচিত; কিন্তু ইহা হইলে তাঁহারা হিরাতের অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ইংরাজেরা তাহা ইচ্ছা করেন না—তাঁহাদের বিশ্বাস এইরূপ যে রুশেরা হিরাতের এত সন্নিকট হইলে সদাসর্ব্বদাই উভয় জাতির মধ্যে কলহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। উপস্থিতে আসল তকরার এই—পরে উভয় পক্ষের লোকজন একত্রিত হইয়া 'সরজমিনে' কি স্থির হয় তাহা বলা যায় না। কিন্তু মোট কথা এই যে হিরাতের কিছু দূরেই থাকুক, কিম্বা নিকটস্থ হউক, রুশীয়ানেরা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় ইংরাজগবর্ণমেণ্টের প্রতিবাসী হইয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের অবজ্ঞা করা কিম্বা তাহাদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করা এখন অসম্ভব। আজ না হয় সন্ধি বিগ্রহ তর্কাতর্কি করিয়া কোন প্রকারে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলে; কিন্তু পরে কি হইবে? আর কিছু হউক না হউক, বাস্তবিক প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করুক না করুক কিম্বা করিতে পারুক না পারুক, যখন একএকবার তাহারা হুঙ্কার ছাড়িয়া সিকারপ্রার্থী ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিবার উদ্যোগ করিবে তখন যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে।

এই ভবিষ্যৎ আপদ নিবারণের জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন যে এখন হইতেই তাঁহারা হিরাত নগরে রীতিমত দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী সৈন্য দ্বারা সংরক্ষিত করিবেন। এতদ্ভিন্ন আফগানিস্থানের উত্তর সীমার স্থানে স্থানেও আপন সৈন্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া সদা সর্ব্বদাই স্বচক্ষে রুশীয়ানদিগের গতিবিধি অবলোকন করিতে পারিবে এবং আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত সময়ে বাধাও দিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত কতদূর আবশ্যক তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় যেন যতদূর সাবধানতা প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা হইতেছে। আমাদের মত এবং বিশ্বাস এই যে আফগান স্থানের এদিকে ভারতবর্ষের সীমায় যদি ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকেন এবং তাঁহাদের পশ্চাদে ভারতবর্ষের রাজারাজওয়াড়ারা এবং সাধারণ প্রজাবর্গ যদি সন্তুষ্ট এবং তাঁহাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে উদ্যত থাকে, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদিগকে রুশীয়ানদিগের আগমনের ভয় করিতে হইবে না।

PRINTED AND PUBLISHED BY NERODE CHUNDER MOOKERJEE AT THE DURBHUNGA TRADING CO.'S, "UNION PRESS."

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; চৈত্র, দ্বিতীয় পক্ষ। [২৪ সংখ্যা।

বঙ্গীয় নবীন কবি ও কাব্য।

আমরা ধীরে ধীরে আর একটি সুন্দর কবিতার সমালোচনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। এই কবিতাটির নাম 'পুর্নমিলন' ইহা পাঠ করিতে করিতে কবির বাল্যবাল বচিত 'ভগ্ন হৃদয়ের' অনেক কথা মনের মধ্যে আসিয়া সমুদিত হয়। উচ্ছ্বসিত পরিপ্লাবিত কবিতাতরঙ্গিণী, যে বঙ্গের হৃদয়ে চারিশত বৎসর হইতে নববর্ষার খরতর স্রোতে শতমুখী হইয়া, ফেনিল জলরাশি উচ্ছলিত করিয়া, কত শস্য পূরিত ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া দিতেছে, সেই বঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের তীব্র বন্যা আসিল দেখিয়া, ভাবিয়াছিলাম যে এইরূপ জলোচ্ছ্বাস দ্বিতীয়বার আসিলে—বঙ্গের হৃদয়ে আর একবার এই রূপ স্রোতঃ বহিলে, সহমরণের ন্যায় হয়ত, ডুবিয়া মরা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইবে; শত সহস্র মনুষ্য ছায়া-সুখ পাইবার নিমিত্ত আত্মঘাতী হইবে; কারণ সংসারে পতঙ্গ-প্রকৃতি মনুষ্যই অধিক, ইহারা অনলশিখার দর্শন মাধুর্য্যে উন্মত্ত হইয়া স্পর্শসুখ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হয়। ধ্বংস ইহাদিগের নিকটে প্রায় নির্জ্জীব, আপনা দিগের জীবনদানেই ইহারা ধ্বংসকে সজীব করিয়া তুলিয়া থাকে।

"ভগ্নহৃদয়ের' অব্যাহতগতি বন্যার ন্যায় কবিবরের কবিতা তরঙ্গিণী হইতে আমরা দ্বিতীয়বারে কোনরূপ জলোচ্ছ্বাস দেখিতে পাই নাই। যাহাই হোক, এখনকার বন্যা গুলি উষর ভূমিকে উর্ব্বর করিতেছে—রুগ্ন ও ভগ্ন প্রাণকে ক্রমে স্বাস্থ্য দিতেছে—আময় জর্জ্জরিত প্রাণিগণকে একটু একটু করিয়া নিরাময়রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। 'আমি-হারা' কবি বহুকষ্টে হারান আমির অনুসন্ধান পাইয়াছেন উঃ—কি অন্তস্তল-স্পর্শিনী অনুসন্ধিৎসা!! কোলরিজ্ একদিন মনে এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন—

"Ah! that once more I were a careless child.

আর আমাদিগের পথহারা নবীন কবি যথার্থ-পথে উপস্থিত হইয়া,—

'এমন দেখিনি কবে, এমন দেখিনি কা'ল এমন দেখিনি বহুদিন।'

বলিতে বলিতে—হর্ষসাগরে ভাসিতে ভাসিতে জগতে বালক হইয়া, শৈশবের যথার্থ আন্তর ভাবোদ্বোধক অভিনয় দেখাইতেছেন। শিশুর সহিত জননীর খেলা আর বালকের সহিত প্রকৃতির খেলা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাই এরূপ অনুধাবন—

কবিগুরু সেক্ষপিয়রও বলিয়াছেন যে 'ভ্রাতায় ভ্রাতায় সৌহার্দ্দের কথাই বা, আর পতিপত্নীর ভালবাসাই বা, মাতার স্নেহের ন্যায় অত গভীর অনন্তবিস্তৃত ভালবাসা আর সংসারে মিলিতে পারে না।' প্রকৃতির প্রিয়পুত্র আমাদিগের কবি, ছোট ছোট দুখানি হাত দিয়া জননীর গলাটি জড়াযে ধরিতেন আর কি বলিবেন বলিয়া, নির্নিমেষলোচনে মার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—সেই কথাগুলি বহুদিন পরে মায়ের নিকটে উল্লেখ করিতেছেন—কথাগুলি শুনিলে, রবিরশ্মিপাতে তুষারস্তূপের ন্যায় স্নেহ যেন আপনি গলিয়া পড়ে, ইহাতেই পাষাণহৃদয়ে মাতৃভক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়। অগ্নি সংযোগে সুবর্ণের নির্ম্মলতা আর অনুতাপদহনে মনের উজ্জ্বলতা যে কি সুন্দর ভাব, এই কবিতাটীই তাহার একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এখন সেই বাল্যলীলার উল্লেখ করিতে করিতে প্রকৃতির নিকটে কবি বলিতেছেন—

'প্রভাত শিশির গুলি ঘাস হতে তুলিতাম
কপালে কপোলে মোর ফোটা২ ফেলিতাম।
তরুণ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিত প্রাণ
বিমল কোমল হৃদে কি যেন ঝরিত গান।'

এই গান কি? প্রকৃতির কণ্ঠোত্থিত এক অত্যাশ্চর্য্য অনাহতধ্বনি—ইহাই নির্ম্মম নিরঙ্কার ভজনানন্দীর নিকট বংশীধ্বনি—পীযূষ হইতেও মধুর। মূর্খ ও পণ্ডুকেরা এ স্বর শুনিতে পায় না, শুনিতেও অধিকারী নহে।

কোন কবি এই স্বরমাধুর্য্য বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন এই অনাহত বংশীধ্বনি সনক সনন্দন প্রভৃতি কৌমার ঋষিগণকেও ধ্যান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। যথা—

'কন্দর্পমুদ্ভূতশচনংকৃতিপরংকুর্ব্বন্ সুনস্তম্বরং
ধ্যানাদস্তবয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্
বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্র-
মাঘূর্ণয়ন্।
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতোব্রহ্ম-
বংশীরবিঃ॥'

এই মুরলী নিক্কণই জগৎ অতীত দিব্য স্থানের পরিপ্লাবক মধুরধ্বনি। ভাবের কুম্ভকে বসিয়া যে চিন্তাশীল ব্যক্তি হৃদয়ের গানের সহিত সেই স্বর্গীয় স্বরলহরীর মিলন রাখিতে সক্ষম হন, তিনিই বুঝিতে পারেন নিশীথকালে জগতে অনাহত বংশীধ্বনির অর্থ কি?

স্বর্গ—অলৌকিক সৌন্দর্য্যময় নিত্যধাম। এই নিত্যধামের বহির্ভাগ রূপময় অন্তর সঙ্গীতে পূর্ণ। যেখানে সৌন্দর্য্য আছে রূপ আছে ও মধুর সঙ্গীত আছে, সেই স্থানের নিমিত্ত মনঃ ব্যাকুল হয়; মনুষ্য কল্পনা করিয়া স্বর্গকে সুন্দর করে জননীর স্নেহ, বালকের হাসি, কুসুমের শোভা, বালিকার সরলতা, ইন্দ্রধনুর মাধুর্য্য ইত্যাদি জগতের সৌন্দর্য্য লইয়া, মানুষে স্বর্গের কল্পনা করিয়া থাকে তাই লৌকিক

জগৎ স্বর্গশোভার আলয় হইয়া দাঁড়ায়। আমাদিগের বালক কবির মনের ভিতর নানারূপ সৌন্দর্য্য একটু একটু করে আসিয়া একটি ছোটখাট স্বপ্নের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাই তখনকার কথা মনে করিয়া কবি বলিতেছেন—

'বিমল কোমলহৃদে কি যেন ঝরিত গান'

শ্রবণের এগান শুনিবার অধিকার নাই। এ গানের শব্দ অন্তঃশ্রবণের শুনিতে যতটুকু অধিকার আছে কেবল অন্তঃকরণই ততটুকু শুনিতে পারে—ততটুকু বুঝিয়া মোহিত হয়।

কবি জননীর কাছে বাল্যকালের কত কথা বলিতেছেন, স্থানে স্থানে কবিত্বের নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে—যথা—

'পুলকে রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর করে'

এইরূপ সুন্দরভাববিশিষ্ট পংক্তি, যে কোন কবির গর্ব্বের বস্তু—ইহা কবিতারূপ সেক্ষপিয়রের যোগ্য।

বাল্যকালের ধূলিখেলার কথা সমাপ্ত করিয়া কবি আবার মার কাছে বলিতেছেন—মা তার পর যে কোথায় গেলাম তাহার ঠিকানা নাই। চলিতে চলিতে এক বনে গিয়া পড়িলাম, এই বনের নামই 'হৃদয় অরণ্য' সে অরণ্যের কূল নাই কিনারা নাই, সে অরণ্যে পাখী ডাকে না, ফুল ফোটে না—বায়ু বহে না—মহাশাখী অতি বিস্তৃত শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া, সূচীভেদ্য অন্ধকারকে বুকে করিয়া বসে আছে। সেই মহা বনের আকাশে একটিও নক্ষত্র জ্বলে না—জ্যোতির্হীন কঠোর চাহনিতে আকাশ দৃষ্টিক্ষেপ করে, সেই মহারণ্য মধ্যে আমি একাকী চক্ষুর জলবর্ষণ করিতে করিতে, হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়া, সুখশান্তি বিহীন হইয়া, যত কাল কাটাইলাম তাহা কেমন করিয়া বলিব।

কবির হৃদয় যে একদিন ভীষণ দহনে দগ্ধ হইয়াছিল তাহা কবি ভীমের আস্ফালনের ভাষায় প্রকাশ না করিয়া, পাঞ্চালীর অশ্রুজলের সহিত অতি মৃদুল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। একদেশ দর্শী ভালবাসার উপর তাক্ত হইয়া, বিশ্বজনীন ভালবাসায় হৃদয়পূর্ণ করিয়াছেন। পূর্ণপ্রেম ও আংশিক প্রেমের পার্থক্য জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। সেই নিবিড় অন্ধকারপূর্ণ অরণ্যানীর মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া কবির রুদ্ধপ্রাণ মুক্ত হইয়া গিয়াছে তাই কবি বলিতেছেন—

'কেহ এসে বসে কোলে
কেহ ডাকে সখা বলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা।
কেহ হাসে কেহ গায়,
কেহ আসে কেহ যায়,
একি হেরি আনন্দের মেলা॥'

চারিদিক্ আনন্দে পূর্ণ দেখিয়া, কবি মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'হাঁ মা! আজি এত আনন্দ কিসের?—উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই আবার বলিতেছেন—'আর বলিতে হইবে না আমি বুঝিয়াছি—হারান সন্তান ফিরে পাইয়াছ বলিয়া তোমার এত আনন্দ, তাই তোমার রাজ্য আজি নূতন উৎসবে পূর্ণ; তাই বুঝি আমাকে কোলে তুলিয়া, আনন্দের গান গাইতেছ। তোমার হারান ছেলেকে দেখিবার নিমিত্ত তাই বুঝি সমীরণ ছুটিয়া আসিতেছে—মেঘমালা বিজলীর হাসি হাসিতে হাসিতে বার বার আমার প্রতি স্নেহের

নয়নে চাহিতেছে ও বার বার আমাকে ডাকিতেছে।

কবি আবার মাকে সুধাইতেছেন—মা! আমাকে দেখিয়া, ফুলগুলির কেন এত আনন্দ হইতেছে? ইহারা কেমন করিয়া আমাকে ভাল বাসিতে শিখিল? ফুলগুলি! আমি প্রাণের সহিত তোদের ভাল বাসিব, তোদেরই গান শুনাইব, তোদেরই প্রাণ দেখাইব।

এই একরূপ ভালবাসা—এ ভালবাসা মূল্য বস্তু নহে, অভিমানকে আহুতিস্বরূপ দিলেই যে এ ভালবাসা মিলে তাহা নহে।

'ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

ইহা দ্বারাও ঐরূপ ভালবাসা ব্যক্ত হয় না। স্বর্গের শিশিরের ন্যায় সুদূরবর্ত্তী আকাশস্থিত শারদচন্দ্রমার হাসির ন্যায়—বসন্ত পবনের হৃদয়ানন্দদায়ী মৃদুমন্দ সঞ্চালনের ন্যায় ঐ ভালবাসার স্বর্গসুখদায়িনী শক্তি, অনন্তভাবে পূর্ণ। একের ভাবে অন্যের নির্ভাবে অথবা উভয়ের নির্ভাবে কিম্বা পরস্পরের ভাবে আত্ম সমর্পণের ন্যায় ঐ ভালবাসা সঙ্কোচ মুখী নহে। যে ভালবাসা প্রকাশ করিলে লঘুভাব ধারণ করে, এ সে প্রকার ভালবাসা নহে। ইহা কস্তূরিকার গন্ধের ন্যায়—ঢাকা, থাকিলেও আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সুন্দর হইতেও সুন্দরতরভাবে পরিণত হয়। কোন সংস্কৃতজ্ঞ মহা কবিও একথা বলিয়া গিয়াছেন যথা—

'লোকোত্তরা গুণশ্রীঃ
প্রথয়তি পরিতো নিগূঢ় মপি বস্তু।
পিহিতামপি প্রযত্নাৎ
ব্যনক্তি কস্তূরিকাং গন্ধঃ॥'

যে বিষয়টিকে আমরা আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা যদি বাস্তবিক অপূর্ণ হয়, কিম্বা কোন অংশে অঙ্গহীন বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে, তাহা ব্যক্ত না করিয়া মাটি চাপা দেওয়াই কর্ত্তব্য।—রবীন্দ্রনাথ বক্ষ্যমান প্রবন্ধে যে প্রেমের রূপ করিয়াছেন তাহা মর্ত্ত্যছাড়া অন্য কোন দিব্য রাজ্যের প্রেম, এ প্রেমের লক্ষণ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সহৃদয় পণ্ডিতেরা ইহাকেই সারসিক প্রেম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'স্তোএবমুভয়তটস্থতাং প্রকটয়চ্চি ওস্তুধত্তেব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রাচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং
বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষপিতাং গুণেন গুরুতাং কেনা
প্যনাতন্বতী।
প্রেম্নঃ সারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি
প্রক্রিয়া।'

"আমাদের অভিনব কবি যে প্রেমের জন্য পাগল, সে প্রেম যথার্থ সারসিক—জগৎ ছাড়া প্রেম। এ প্রেমে লৌকিক কোন আটা নাই অথচ হৃদয়ে একবার স্পৃষ্ট হইলে এমন কামড়াইয়া ধরে যে আর ছাড়ান যায় না।" যথা—

'ভ্রমিলাম দূরে দূরে কে জানিত বল দেখি
হেথা এত ভালবাসা আছে
যেদিকেই চেয়ে দেখি সেইদিকে ভালবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
হেথা যারে ভালবাসি ফিরে দেয় ভালবাসা
নাহি হেথা নিরাশ প্রণয়
কাঁদিলে কাঁদিতে থাকে হাসিলে হাসিয়া উঠে
জগতের করুণ হৃদয়॥
মা আমার আজি আমি, কতশত দিন পরে,
যখনি রে দাঁড়ানু সম্মুখে,

অমনি চুমিলি মুখ কিছু নাহি অভিমান
অমনি লইলি তুলে বুকে॥
ছাড়িব না তোর কোল যব হেথা অবিরাম
তোর কাছে শিখিব যে স্নেহ।
সবারে বাসিব ভাল কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভাল বাসিবে যে কেহ॥

ধন্য রবীন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার লেখনী। ধন্য তোমার মনের ঔদার্য্য! যে দেশের পাঠক এই প্রকার উচ্চদরের ভাব লইয়া নাড়াচাড়া করে, কুরুচি সে দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া, অন্যত্র পলায়ন করে—ইহাতে আর একটুও সন্দেহ নাই। বড় বড় বক্তৃতার সহস্র চীৎকারে শত সহস্রআর্ত্তনাদে যে কার্য্য সংসাধিত না হয়, এমন একটি চিন্তাপূর্ণ কবিতায় তদপেক্ষা অধিক কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে।

ঐ কঠোর জ্ঞানী পণ্ডিতবর বেহমকে বলিতে দাও 'There is a natural opposition between Poetry and truth' কিম্বা ঐ কবরের দ্বার উদ্ঘাটিতপূর্ব্বক মেকলে আসিয়া বলুন—'As civilisation advances poetry almost necessarily declines' কাহারও কথায় কর্ণপাত করিব না। সত্যতাপূর্ণ, প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সঙ্গীত কবিগণ গাও নির্জ্জীব বঙ্গ ক্রমে ক্রমে নবজীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠুক—স্বর্গীয় নবভাব সঙ্কীর্ণ মনের বিশালতা সম্পাদন করুক, শাপভ্রষ্ট পারিজাতের যোজনগামী গন্ধ আবার চারিদিকে ধাবিত হউক—আমরা দেবতার ন্যায় আবার আনন্দ অনুভব করিতে থাকি।

এর পরেই মহাস্বপ্ন—অর্থাৎ নির্ব্বাণ সঙ্গীত। 'সর্ব্বভূতগত ব্রহ্মের অংশবিশেষ পূর্ণভাবে নিশিয়া যাক্—' এই ভাবটি দেখিবার নিমিত্ত কবির চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। রাহু, কেতু, চন্দ্র, সূর্য্য অগণ্য গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথ্বী, পবন, আকাশ, সাগর, নদ, নদী, পর্ব্বত, রসাতল, তলাতল ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ প্রভৃতি পদার্থ সমষ্টি যে ব্রহ্মাণ্ডপতির অন্তঃসমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় ভাসিতেছে, যাঁহার অপ্রাকৃত লোমকূপের মধ্যে প্রতিনিমেষে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত প্রবিষ্ট ও বহির্গত হইতেছে, সেই অঘোষ অচিন্তনীয় দেবাদিদেবের রূপ ধ্যান—বিগ্রহবিহীন চেতনার রূপ কল্পনা কি এক আশ্চর্য্য ভাব। অথবা আশ্চর্য্য হইতেও কি যেন কি—ভাষায় তাহার অনুরূপশব্দ নাই যে ব্যক্ত করা যায়, এইখানেই রবীন্দ্রনাথকে বলিব—

He is not for an age but for all time

জীবনের পৌনঃপুনিক কার্য্যকলাপের মধ্যে ডুবিয়া যাহারা স্ববিশাল মনুষ্যহৃদয়কে শয়ন ভোজন অথবা বিলাসের গোশালা করিয়া তোলে, তাহারাই নরপশু। জগতে দুই শ্রেণীর মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, এক মনুষ্যত্বের মানুষ, অপর নীচত্বের মানুষ, মনুষ্যত্বের মানুষ পৃথিবীতে এমনভাবে দণ্ডায়মান হন যে নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা তাহার নিকটেও আসিতে পারে না—তিনি স্বর্গকে পৃথিবীর এত নিকটে আনয়ন করেন যে সময়ে সময়ে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া থাকে—আর নীচত্বের মানুষ এমন বামনীভাব প্রাপ্ত হয় যে তাহারা পশুদিগের মস্তকের উপর আর মাথা তুলিতে পারে না—ঘানীর বলদের মত অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে একভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এদের চোকে আর ঠুলি দিবার প্রয়োজন হয় না।

মহাদেবের হৃদয় স্বপ্নের খেলা খেলিতেছে, এ হৃদয়ে চন্দ্র উঠিতেছে, গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে ছুটিতেছে, ঝটিকা পথভ্রষ্ট হইয়া বৃক্ষরূপ শত শত বাহু নাড়িতে নাড়িতে হাহারবে ছুটিতেছে, কোথাও বা চেতনার কোলাহলে দিবস নিরন্তর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আছে আবার কোথাও বা নিশা যোগিনীরূপ ধারণ করিয়া ঝিল্লীরবে মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে—হেথা—

'সমস্ত একত্র মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
চারিদিক।
উঠিছে মহাহৃদে মহা এক স্বপন
সঙ্গীত।'

ধর্ম্মটির স্বপ্নটি এবম্বিধ, এই স্বপ্নের মধ্যেই জীবগণ নূতন দেহ ধরিতেছে কবি তাই বলিতেছেন -

'এক শুধু পুরাতন আর সব নূতন নূতন
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন
স্বপন।'

একটু আদরের বস্তু পুরাতন হইলে সমধিক সম্মানের বস্তু হয়। পুরাতনের সহিত জীবনের যতটা বন্ধ সম্বন্ধ, এমন আর কাহারও সহিত নহে। 'অনন্ত' পুরাতন এখানে পুরাতনের মধ্যেই ভয়, ভক্তি, আদর, শ্রদ্ধা সমুদয়ই প্রকাশিত হইতেছে এইখানেই কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'পূর্ণআত্মা জাগিবেন কভু কি আসিবে
হেন দিন
অপূর্ণ জগৎস্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে
বিলীন।'

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র স্বপ্নময়ী ছায়া, দেব! তোমার জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে সব মিশায়ে যাইবে এমন দিন কবে আসিবে? অপূর্ণ সত্য—পূর্ণ সত্যে মিশিয়া যাইবে, এমন দিন কবে আসিবে দেব? আবার শুধাইতেছেন—

'কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়?'

ইহাকেই বলে নির্ব্বাণ প্রলয়। এ প্রলয়ে দ্বাদশ সূর্য্য উঠিবে না—মহা বন্যায় চারিদিক ভাসিবে না—মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িবে না—ভগবান ব্যোমকেশের মহাবিষাণ বাজিবে না ইহাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুতে পরিণত হইয়া সূচীবিধ্য অন্ধকারে বিলীন হইবে।

It is lamentable when philosophers are enemies to poetry

প্রভাত সঙ্গীতের অন্যান্য কবিতার উল্লেখ করিব না, কারণ সে সকল কবিতা বড় অধিক দিন টেঁকিবে না। ইহার মধ্যে 'সাধ' ও 'স্রোত:' অতি সুন্দর, 'সাধ' পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও সাধ মেটে না।

'হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়
আপন সুখে ফুলের মত
আকাশ পানে ছুটিতে চায়'

এই সাধ কবির হয় বলিয়া, হয়ত কেহ কেহ কবিকে পাগল বলিবেন—কিন্তু তাহা নহে পাঠকের একটু সহৃদয়তা থাকিলেই ইহার গাঢ়তা ও উচ্চতা অনায়াসেই হৃদ্গত হইবে।

স্রোতের মধ্যে—

'মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে
শিশুর পানে ধাই,
দুঃখীর সাথে কাঁদি আমি
সুখীর সাথে গাই''

কবির 'চেয়ে থাকা' ও 'সাধ' উভয়ই এক দ্রব্য; উভয় কবিতায় ভালবাসার

সুন্দর চিত্র আছে, এ ভালবাসার ধরপিপাসায় হৃদয় বিশুষ্ক হয় না, ইহাতে বিরহের দাহন নাই—দীর্ঘশ্বাসের ঘন ঘন বহন নাই। মহাব্যাপক মমতা ও লোকাতীত স্নেহে ইহা বিনির্ম্মিত। ইহাতে পরপূজা হইতে আত্ম পূজা এবং আত্ম পূজা হইতে পর পূজার সংযোগ আছে। ভালবাসিতে হইলে পর পূজার আবশ্যক, যিনি পূজ্য হইয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট তিনি সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন। আর যিনি আপনাকে হেয় মনে করিয়াও শুচিমেধা আত্মার পূজার আয়োজনকরতঃ সাধকের পদে ব্রতী হইবার চেষ্টা করেন—'আমি সাধক' বলিয়া গৌরব করেন, তাঁহার আয়োজন অশুচি বলিয়া দেবতারা বৈমুখ্য অবলম্বন করেন।

'সৌন্দর্য্যানুরাগের নামই প্রেম। এই অনিত্য জগৎবাসী আমরা এতই সৌন্দর্য্যবিহীন যে, প্রেমকে একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে বড়ই ভালবাসি, আর সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর দ্রব্য সঞ্চয় করিতে পারিলেই মনে করি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য এক চেটে করিয়া লইয়াছি। এই সুন্দর দ্রব্য কটা কোন একটা বস্তু বিশেষের তলায় চাপা পড়িলেই চীৎকার করিয়া কেঁদে উঠি ও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া মরিবার জন্য দড়ী কলসীর জোগাড় করি। আত্মহত্যার নিমিত্ত ছুরিকা বা বিষভাণ্ডের অন্বেষণ করি—আমরা নিজে সুন্দর নই, তাই এরূপ পৈশাচিক অভিনয়ের চেষ্টা! যে নিজে প্রকৃত সুন্দর সে সৌন্দর্য্যকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করে না। বাস্তবিক আমরা সুন্দর নই বলিয়া সৌন্দর্য্যের আদর বুঝি না এবং অসুন্দরকেও সুন্দর বলিয়া মনে করি—রবীন্দ্রবাবু নিজে সুন্দর ও প্রেমিক তাই জগৎকে সৌন্দর্য্যপূর্ণ দেখিয়া বলিতেছেন—

'মনেতে সাধ যেদিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।
প্রাণেতে শুধু জাগিবে প্রেম
নয়নে লাগে ঘোর।
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর।।'

ইহাই ত সৌন্দর্য্যের ভাষা ও যথার্থ প্রেমিকের গাথা। এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমের নিমিত্তই কবি দেবতা—'A true poet-soul, for it needs to be struck, and the sound it yields will be music

প্রভাত সঙ্গীতের ভাবান্তরিত প্রস্তাবগুলি বেশ রুচির সহিত নির্ব্বাচিত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্জ্জন নামক প্রস্তাবে—কন্যা, পিতৃগৃহ ছাড়িয়া পতিভবনে গমন করিতেছেন, কোন গুরুজন বলিতেছেন—

'যে তোরে বাসেরে ভাল,
তারে ভাল বেসে বাছা
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই
এখন তাহারি তুই হোস্।'

এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে দুষ্মন্তের গৃহে শকুন্তলাকে পাঠানের কথা ও কুলপতি কণ্বের উপদেশের কথা আপনা হইতেই মনে আসিয়া উদয় হয়।

শ্রীজগগোপাল গোস্বামী।

কাননবালা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(গার্হস্থ্য কথা।)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

সেই দিন অপরাহ্নে কিরণ কাননের মর্ম্মস্পর্শী অশ্রুজল ও অপর্ণাদেবীর সস্নেহ আশীর্ব্বাদ লইয়া বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বিশেষ কোন ক্লেশ হয় নাই, তবে মাঝে মাঝে কাননের সেই অশ্রু পরিপ্লুত নয়ন দুইটী মনে পড়িয়া কিরণের চিত্তকে একটু চাঞ্চল্যময় করিয়াছিল। প্রথম দুইদিন অবিশ্রান্ত পথ হাঁটিলেন, তৃতীয় দিবস নৌকা করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেদিনীপুর পঁহুছিলেন। মেদিনীপুর হইতে বরভীপল্লী বেশীদূর নহে, সন্ধ্যার মধ্যেই বাটী পঁহুছিলেন।

মাতা ও পিতৃষসা ঠাকুরাণী সরসী ও সরসীর মাতাকে দেখিবেন বলিয়া বড় উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কিরণকে একক বাটী প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাতা কহিলেন,—'এস বাবা।—কই তাঁহারা আসিলেন না?'

কিরণ কহিলেন,—

'তাঁহাদের আসিতে বিলম্ব হইবে। গুরুদেবের আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।'

'অচলানন্দ ঠাকুর তাঁহার না গুরু?'

'হাঁ, আমি এত দিন তা জানিতাম না, সে দিন তাঁহার মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।'

'তিনি কবে অনুমতি করিবেন, মেয়ের বয়স হইল, বিয়ের বয়স গেলে, তবে কি তিনি অনুমতি দিবেন।'

'আমাদের অপেক্ষা অবশ্য তিনি অধিক বুঝেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা সদুপায় করিবেন'

পিতৃষসা ঠাকুরাণী কহিলেন,—

'আহা। ভগবান আবার এমন দিন কবে দিবেন, কবে তাঁহাদের আবার তেমনি ঘর সংসারী দেখিতে পাইব।—হ্যাঁ কিরণ। সরসী কত বড়টী হয়েছে?'

কিরণ মৃদু হাসিয়া বলিল,—

'বয়স যেমন—তত বড়টী।'

'তুমি কাল গিয়ে ঠাকুরকে বলিও, যা'তে তিনি একটু শীঘ্র শীঘ্র তাঁদের আসিতে বলেন। ঠাকুর আবার যে সকলের সঙ্গে কথা কন না, নহিলে আমি আপনি গিয়া তাঁকে ব'লে আসিতাম।'

সেই সময়ে বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি (দাসী) বলিল,—

'তোমরা যেন কি!—বাছা এ'ল, মুখ, হাত, পায় জল দিক্, একটু বসুক, জিরুক,—ওমা! একেবারে চারিদিক থেকে যেন হাটের গোল লাগিয়ে দিয়াছ! এস বাবা! মুখ হাত ধুইবে!'—বলিয়া বুড়ী কিরণের হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

তার পর কিরণ কতক্ষণ বিশ্রাম করিল—কি আহার করিল, কখন নিদ্রা গেল—সে কথা আমরা ঠিক শুনি নাই। তার প্রভাতে উঠিয়া তিনি কি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

কিরণ প্রাতঃকৃত্য করিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটী অন্তঃপুর সংলগ্ন ছিল বটে, কিন্তু অন্তঃপুর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। কক্ষের ভিতর বড় বড় কাঠময় আধারে অনেকগুলি পুস্তক রক্ষিত ছিল, মধ্যভাগে একটী টেবিল, ও তাহার পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার থাকিত। কক্ষটী বেশ সুসজ্জিত ছিল, কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর য়ৌরাণিক প্রতিমূর্ত্তি থাকায় কক্ষটী অধিকতর সৌন্দর্য্যময় বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। কিরণ এই কক্ষে অধ্যাপনা করিতেন—এই জন্য পুস্তক ও বিবিধ রাশিজ পত্রাদি এইখানে থাকিত।

কিরণ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই রাক হইতে কয়খানি পুস্তক লইয়া সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিলেন—এবং পুস্তক খানি খুলিয়া স্থানে স্থানে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে দৃষ্ট পুস্তক হইতে অপসৃত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইল,—তাহার পর—ভীষণ দুর্য্যোগের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন স্থির ভাব ধারণ করে—কিরণও তদবস্থ হইলেন—দৃষ্টি ভূপৃষ্ঠ অবলম্বন করিল, হস্তস্থিত পুস্তক হস্তচ্যুত হইল—কিরণ ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

যখন চিন্তা ভাঙ্গিল—কিরণ বড় বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন—তাহার সম্মুখে, টেবিলের উপর, তাঁহার পুস্তকখানি চাপা দিয়া কে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছে। কিরণ পত্রখানি উন্মোচন করিলেন,—তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল,—

'দাদা!

কুল রমণীর স্বামী বা সুপরিচিত কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও পত্র লেখা সামাজিক নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং পূর্ব্বেই সে বিষয়ে সাধ্য মত ক্ষমা চাহিয়া রাখা ভাল। কিন্তু সে কথা জানিয়াও বিষম দায়ে ঠেকায় চাহিনা আমাকে আজি এই নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল।

আমি ও চিনিয়াছি কি? বাল্যে যখন মাতৃ ক্রোড় হইতে অপনি আমায় পার্শ্বে মাতৃল কন্যাগণ দাঁড়াইয়া তোমার কত উপদেশ পূর্ণ মর্ম্মময় গল্প শুনিত তাহার সঙ্গে আর কাহাকে কি দেখিতে? মনে পড়ে—তোমায় তামায় দাদা বলিতে বলিয়া আর প্রাণের তোমায় দাদা বলিয়া ডাকিবার জন্য ব্যগ্র হইত—আর তুমি সমান স্নেহে তাহাদের সম্বোধন করিয়া উত্তর দিতে। তার পর আর অনেক দিন তোমায় দেখি নাই,—কালে আমার জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—তোমারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু যখনই বাতাবও মুখে কোন গল্প শুনিতাম, অমনি তোমায় মনে পড়িত, তোমার সুন্দর উপকথা মনে পড়িত, আর তোমার অনন্ত ভ্রাতৃস্নেহ মনে জাগিয়া উঠিত, মনে হইত—বুঝি তেমন স্নেহ আর কেহ করিতে জানে না—তেমন তেমন স্নেহ আমার সহোদরের নিকট হইতেও কখন পাই নাই। সে কথা আর এখন বলিয়া কি হইবে। এখন যে জন্য আবার তোমার সমীপস্থ হইয়াছি, তাহাই এখন বলিব, কিন্তু একটী প্রার্থনা আছে,—

তুমিই উপদেশ দিতে, স্ত্রীলোকের লজ্জা এবং শীলতা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা হইতে যে বিচ্যুত হয় সে নারীর অধম। আমি আজি প্রগল্‌ভার মত তোমার সমীপস্থ হইয়াছি, ভগিনী বলিয়া আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবে ত?

আমার শ্বশুর ঠাকুর সম্বন্ধে তোমার কিছুই অবিদিত নাই, তিনি যাহাই হউন, তিনি আমার পূজ্য,—তাঁহার নিন্দা করা, বা তাঁহার কোন কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা বা তাঁহার কার্য্য আন্দোলন করা আমার অতীব অন্যায়। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই, যদি সে দেখিতে পায়, কোন নির্দ্দোষী অকারণ কাহারও কোপকটাক্ষে পড়িয়াছে, তখনই তাহার প্রাণ তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠে, তাহার নির্দ্দোষ মস্তকে খড়্গ পড়িবার পূর্ব্বে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে মন ব্যগ্র হয়,—তাই আজি তোমার কাছে আসিয়াছি, কিন্তু মনে রাখিও, আমি তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছিমাত্র, আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়কে বিপদাপন্ন করিতে আসি নাই।

কথাটা এই, তুমি সদ্বিবেচক, তোমাকে আর কি বুঝাইব—প্রলোভনকে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু বিশেষ সাবধানে চলিবে, সে পথ বড় পিচ্ছিল—আজি সাবধান হইতে পারিলেই জীবনের একটী সমূহ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।'

তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—ভগিনী

'সুধীরা।'

কিরণ স্থিরভাবে পত্রখানি পড়িলেন। তাঁহার সমূহ বিপদ কিরূপে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনে করিলেন,—'যদি যথার্থই কোন বিপদ ঘটে—ঘটুক, ক্লেশ, দুঃখ বিপদের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য—আমিও প্রস্তুত থাকিব,—ভাবিয়া অনর্থক মনের ক্লেশ উৎপাদন করি কেন?' তাহার পর আপনাপনি কহিলেন, — 'আহা! সেই সুধীরা!—সুধীরার এখনও আমায় স্মরণ আছে! সুধীরা প্রকৃতই সুধীরা! কিন্তু বালা দানবপুরীর বধূ হইয়া এ চিন্তা অসহনীয়! কিন্তু তা' বলিয়া কি সে সুখী নয়?—না, বিধাতার ত সে নিয়ম নয়, তিনি যে দয়ার সাগর!'—আমরা আপনা হইতে ক্লেশ পাই—তিনি আমাদের সকলি সুখের করিয়াছেন। আর যে যেমনই হউক, স্বামী ভাল হইলেই রমণীর সুখ, চারুচন্দ্র বড় ভাল, কণ্টক বৃক্ষেও সুন্দর ফুল ফুটে'—আবার সেই বাড়ীরই ত অতুলনীয়া মূর্ত্তিমতী সরলতা সরসীবালা!—কণ্টকক্ষেত্রে কনকপুষ্প। তবে পুরির দোষ কি? আহা! পরের ক্লেশে যে কাতর,—পর দুঃখে যাহার হৃদয় অতি মহান্‌ভাবে পূর্ণ—অতি সুন্দর!—এমন গুণবতীরমণী জগতের অলঙ্কার।'

কিরণ নীরব হইলেন। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাপি কোন মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না, ভাবিলেন, 'প্রকৃত বিষয়টা কি, এখনও ত বুঝিলাম না। প্রলোভন? কিসের প্রলোভন। দূর হউক আর ভাবিব না।'

কিরণ উঠিয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। অন্যমনস্কভাবে কত কি ভাবিতে লাগিলেন—সহসা বহির্দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল—কিরণের দৃষ্টি তদ্দিকে ধাবিত হইল, দেখিলেন, দত্তদিগের দাসী বামা দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বামার দিকে কিরণের চক্ষু সম্পাত হইলে, বামা জিজ্ঞাসিল,—'কেমন কিরণ ব'বু! ভাল আছ ত?—এ কয় দিন দেখি নাই যে?'

কিরণ স্থির দৃষ্টিতে গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—'স্থানান্তরে গিয়াছিলাম।—তুমি এখানে যে?'

'এই—দেখিতে আসিলাম।'

'কেবল দেখিতে?—প্রকৃত কথাটা কি? কোন প্রয়োজন আছে নাকি?'

দাসী যেন কত অবাক্ হইয়া কহিল, 'ওমা! কেবল দরকার থাকিলেই লোকের বাড়ী লোক যায় গা?"

'তবে তোমার কি কিছু দরকার নাই?'

দাসী কটাক্ষ বিস্তার করিয়া মুখ ঘুরাইয়া কহিল,—

'না থাকিবে কেন—আছেই ত—তার আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কি?'

কিরণের ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা দিল—এ হর্ষের হাসি নহে—বিরক্তির। কিরণ কহিলেন,—'তাই বলিলেই ত হইত, সেই কথাই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন আছে?'

'আমার আবার কি প্রয়োজন থাকিবে বাছা! আমাদের ছোট ঠাকুরুণটী কি চিঠি দিয়াছেন—তাই নিয়ে এসেছি।'

কিরণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—

'আমাকে চিঠি!—আমাকে চিঠি কেন?'

'কে জানে মা কেন!—তোমাদের কথা তোমরাই জান, মাঝে হ'তে আমি নিমিত্তের ভাগী হই কেন? যে যা' ব'লছেন তাই কয়তেছি, এর ভিতর—এ কেন—সে কেন—তা' কেমন ক'রে বু'ঝব বাবু?'

কিরণ ক্ষণেক চিন্তিত হইলেন,—পরে কহিলেন, 'তুমি ও পত্র লইয়া যাও, আমি পত্র লইব না,—যাহার পত্র তাহাকে ফিরাইয়া দিও। এক দিন, দুই দিন বহুদিন প্রতারিত হইয়াছি—আর প্রতারিত হইতে চাহি না—আমি সাধ করিয়া অনেক অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছি।'

'কেন দিদি ঠাকুরুণ তোমার কি ক'রেছে গা?'

'যাহাই করুন—তুমি এ পত্র ফিরাইয়া দিও—আর বলিও, কিরণের চক্ষু ফুটিয়াছে, আর সে তোমার ঘৃণিত প্রলোভনে ভুলিবে না—তবে কি সে কখন ভুলিয়াছিল—তাহা নহে, তবে তিনি যদি ইহা বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন।'

'ওমা! এই শুনিতে পাই গলায় গলায় ভাব—আবার এর মধ্যে একি ভাব? কোথায় যাব মা। কলীর ভাব দেখে দেখে অবাক্ হইলাম।'

কিরণ কহিলেন,—

'আর তোমার কিছু প্রয়োজন আছে?

'ভাব কি থাকবে বাছা?'

'তুমি যেতে পার।'

'যাব না, ত কি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থা'কব?'

কিরণ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন,—'তবে যাও।'

বামার চোক, কাণ, মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল, আর ক্ষণমাত্র দাঁড়াইল না, গর্ গর্ করিয়া কত কথা বলিতে বলিতে গেল—আর বলিল,—'এমন অহঙ্কারের কথাও ত কখন শুনি নাই। তুই কাল্‌লের ছেলে, তুই আবার আমায় বলিস্ 'যা'! বড় টাকার

গর্ব্বী হ'য়েছে। কার কাছে টাকার গর্ব্বী করিস্? দত্তদের মেয়ে—যার চেয়ে ভাগ্যি বস্তু আর নেই—তাকে কিনা অপমান। ওরে ছোঁড়া! কর্ত্তা এ কথা শুনিলে যে তোর ভিটেয় থাকা দায় হবে। তা' একবার ভাবিলি না? মরিবার আগে পীপড়ার এমনি করিয়াই পালখ উঠে।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে রামা চলিয়া গেল।

কিরণ চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তে আর এক পদচারণা করিতে লাগিলেন। আবার কি ভাবিয়া দাসীকে ডাকিয়া কহিয়া দিলেন, 'দত্তদিগের রামা চলিয়া গেল—তাহাকে ডাকিয়া আন বলিও আমি পত্র লইব।'

দাসী রামাকে ডাকিতে গেল। কিরণ ভাবিতেছিলেন, 'যদি সুষমা প্রকৃত দোষে দোষী না হয়, অকারণ তাহাকে তিরস্কার করিলাম কেন? কে বলিল, সে আমায় প্রতারণা করে? কেন অকারণ তাহার পত্র ফিরাইয়া দিলাম—কি লিখিয়াছে একবার দেখিলাম না কেন?—সে আমার বাল্যসখী, আমায় ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করে সে স্নেহে কি কালকূট থাকিতে পারে?—তাহাকে অবিশ্বাস করা আমার ভাল হয় নাই।'

রামা ফিরিয়া আসিল। আসিয়া হাসিয়া ভ্রূকুটী করিয়া কহিল,—'আবার এত অনুগ্রহ হইল যে?'

কিরণ স্থিরভাবে কহিলেন,—'এইরূপে বাল্যস্মৃতি ভুলিব ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু ভুলিতে পারিলাম না। দাও, দেখি, তাঁহার কি আদেশ।'

রামা সহাস্যে পত্রদান করিল। কিরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন:—

'প্রাণের কিরণ।'

সে সাধের দিন সুখের সময় কি আর আসিবে না? কে জানিত অভাগিনীর ভাগ্যে এ বিপদ্‌পাৎ ঘটিবে,—কে জানিত আমার কিরণ আমার হইবে না? হায়! বাল্যের স্মৃতি কত মধুর—যে কখন বুঝিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে না। হায় কিরণ! সে কাল কত সুখের ছিল, যখন তোমাতে আমাতে সেই তটিনীর বালুকারাশির উপর বসিয়া চাঁদের কিরণে উভয়ে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রাণের গীত গাইতাম। এ সর্ব্ব সুখনাশিনী সামাজিকতাড়না শুকগঞ্জনা লোকলাঞ্ছনার বিভীষিকা ছিল না। সে দিন কি আর ফিরিয়া আসে না? তেমনি করিয়া আর কি তোমায় পাইব না? হৃদয় ভরিয়া আর কি তোমায় ডাকিতে পাইব না? বক্ষঃ পাতিয়া আর কি তোমায় লইতে পারিব না—হায়! সে আশা দূরে থাক্,—দিনান্তে একবার তা'ও ত দেখা মিলে না! কেন কি অপরাধে এ যাতনা সহি বলিতে পার কি?

ভাবিয়াছিলাম, মনের জ্বালা মনেই নিবাইব—জগতে এ কথা প্রকাশ হইতে দিব না—কিন্তু প্রাণ যে কথা শুনে না—হৃদয় যে মানা মানে না—এ উচ্ছ্বাস প্রতিহত করিতে যে অভাগিনীর সাধ্য নাই'—নতুবা এ কলঙ্কিনীবেশে প্রাণের কথা লইয়া—তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইত না।

মনে পড়ে—তোমার কাছে যখন পড়িতে যাইতাম—একদিন পড়ি নাই, মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া শুইয়া পড়িলাম, আর তুমি কত যত্নে আমার মাথা তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলে। তেমন সুখ আর অদৃষ্টে ঘটে নাই, তখনও বুঝিয়াছিলাম, 'তেমন সুখ আর কখন অদৃষ্টে ঘটিবে না'—তাই কাঁদিয়া

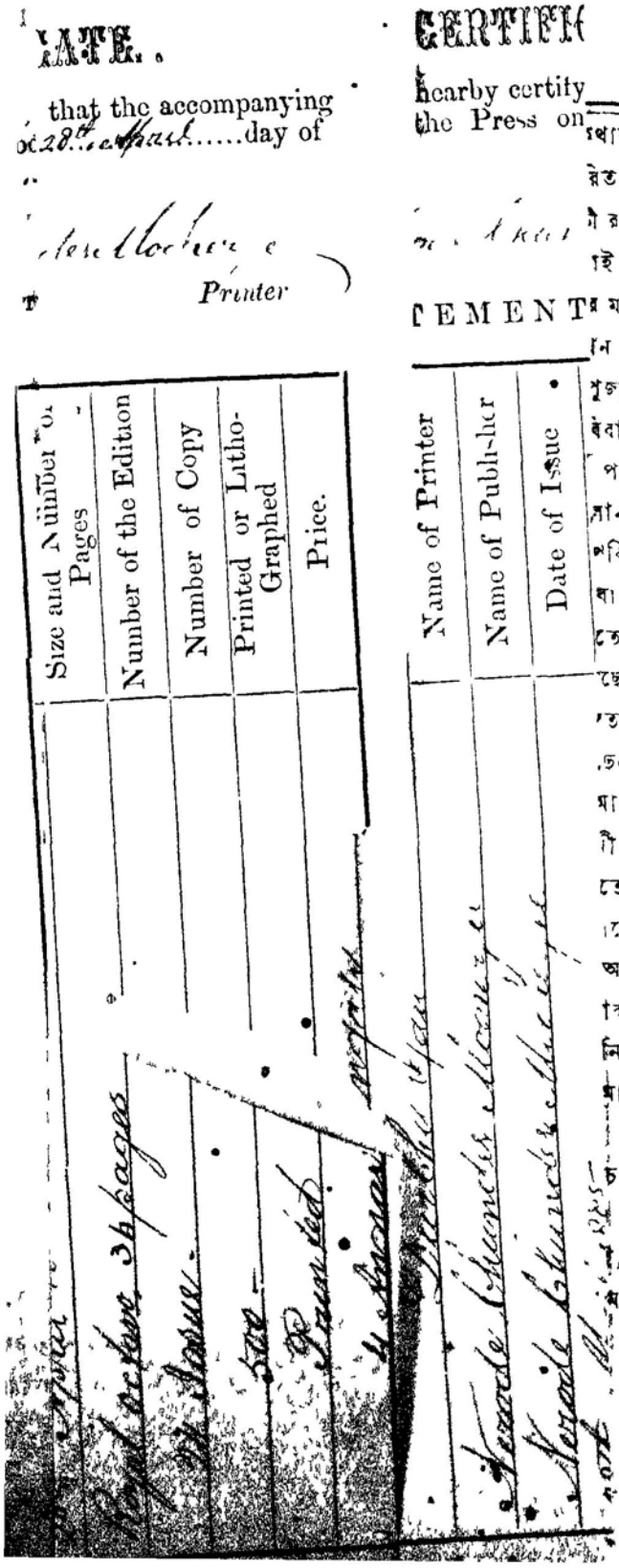

থায় কাজ নাই। যে উদ্দেশ্যে
রিত হইল, তাহাই এখন
ী রাখিবে কি ? আমি ঘোষ
াই এ প্রস্তাব করিলাম—
T E M E N T র মত তোমার নিকট একথা
ন বলিতাম না। কথাটা
পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহা
ধবাহ বিচার' পড়িয়াছি,—
পড়িয়াছ, আর যখন আমরা
লাম, আমাদের বাটীর পার্শ্বে
বিবাহের বাস ছিল, তাঁহা-
ধবা কন্যার নব সম্প্রদায়ের
তে দেখিয়াছি—এবং তাঁহা
ছে, বিধবার বিবাহে অধর্ম্ম
ত। বিদ্যা সাগর মহাশয়ও
ছেন, বিধবা বিবাহ অধর্ম্ম
ন।রও এ প্রস্তাবে লজ্জা
ী বহুকাল হইতে এ চিন্তা
তেছে। তোমার একটী
দেশ পাইলেই হৃদয়-গিনী
আমি আশা পথ চাহিয়া
ার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ
নিহিত রহিল—আজি হয়
ার জন্য ব্যবস্থা হইবে।
কথা,—বহুদিন হইতে
চরণ দর্শনে বঞ্চিত আছে।
আজি সন্ধ্যার পর যেন
, আশা পথ চাহিয়া রহি-
ার কর্ত্তব্য তুমি করিও।'

একান্ত শ্রীচরণাভিলাষিণী
'সুষমা'

ক্রমশঃ—

ছিলাম, অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কিন্তু তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি শিরঃপীড়ায় অস্থির হইয়া রোদন করিতেছি। তাই ব্যাকুল হইয়া বারম্বার আমায় কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া কি উত্তর দিয়া ছিলাম স্মরণ নাই। এমন কি সে মুহূর্ত্তে অতীত বর্ত্তমান ভুলিয়াছিলাম—অভাগিনীর দুরদৃষ্ট ভুলিয়া ছিলাম, ভাবিতে ছিলাম পতির ক্রোড়ে শুইয়া, পতির পবিত্র মুখ দেখিতেছি। হায়! পোড়া স্মৃতি যদি তখন ইহকালের জন্য লুপ্ত হইত, তবে এ দারুণ নৈরাশ্যের বিষ দশনের তীব্রদংশনে অহরহঃ জ্বলিতে হইত না। সে মুহূর্ত্তে সে সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আমি গম নোন্মুখিনী হইলাম, তুমি আশ্চর্য্যভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি গর্ব্বিতবাক্যে বলিলাম,—'আমার পিতার গৃহ আছে।' তুমি আমার কথার অর্থ বুঝ নাই, আমার বুদ্ধির কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে ভাবিয়া, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের বাহিরে আসিলে আমি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলাম,—'সঙ্গে আসিও না, আমার যথা ইচ্ছা তথায় যাইব, তোমার তাহাতে কি? ভা বাসি,—কিন্তু ভালবাসার ভিখারিণী নহি।' তুমি আমার কোন কথারই মর্ম্মগ্রহ করিতে পার নাই—মলিন মুখে ফিরিয়া গেলে। আমি দারুণ দুঃখে তীব্র জ্বালায় উৎক্ষিপ্ত হৃদয়ে বাড়ী আসিলাম। এ কথা কি তোমার মনে আছে? তোমার মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমার এ কথা চির-দিন মনে থাকিবে!

যাক্, সে কথায় কাজ নাই। যে উদ্দেশ্যে এ লিপি প্রেরিত হইল, তাহাই এখন বলিব। কথাটী রাখিবে কি? আমি দোষ ভাবি না বলিয়াই এ প্রস্তাব করিলাম—নতুবা নির্লজ্জার মত তোমার নিকট একথা মুখ ফুটিয়া কখন বলিতাম না। কথাটা এই,—আমি পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহা শয়ের 'বিধবা বিবাহ বিচার' পড়িয়াছি, তুমি ও বোধ হয় পড়িয়াছ, আর যখন আমরা কলিকাতায় ছিলাম, আমাদের বাটীর পার্শ্বে এক ভদ্রসন্তান পরিবারের বাস ছিল, তাঁহা-দের একটী বিধবা কন্যার নব সম্প্রদায়ের মতে বিবাহ হইতে দেখিয়াছি—এবং তাঁহা দের বিধানে আছে, বিধবার বিবাহে অধর্ম্ম নহে বরং ধর্ম্মসঙ্গত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সপ্রমাণ করিয়াছেন, বিধবা বিবাহ অধর্ম্ম নহে। তবে আমারও এ প্রস্তাবে লজ্জা কি? অভাগিনী বহুকাল হইতে এ চিন্তা করিয়া আসিতেছে। তোমার একটী কথা একটী আদেশ পাইলেই হতভাগিনী চরিতার্থ হয়। আমি আশা পথ চাহিয়া রহিলাম,—আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ তোমার পদে নিহিত রহিল আজি হয় স্বর্গ নয় শ্মশান আমার জন্য ব্যবস্থা হইবে।

আর একটী কথা,—বহুদিন হইতে অভাগিনী ও শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত আছে। দেখা দিবে কি? আজি সন্ধ্যার পর যেন নিশ্চয় দেখা পাই, আশা পথ চাহিয়া রহি-লাম, এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিও।'

একান্ত শ্রীচরণাভিলাষিণী

'সুষমা'

ক্রমশঃ—

পিসিমার পত্র।

[প্রেরিত।]

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান 'পাক্ষিক সমালোচক' সম্পাদক

বাবাজীউ সমীপেষু।

বাপুরে।

তোমার পত্রিকায় * কোথাকার একটি মহিলা সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া যে কিরূপ সুখী হইলাম তাহা পত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া কি বলিব? সভায় যে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে—অর্থাৎ তরকারি—তাহা বড়ই গুরুতর বিষয়। সভার ইচ্ছা যে অজস্র তরকারি রন্ধনের প্রথা, যাহা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাহা অচীরে দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমিও প্রাণের সহিত সভার এই মহদিচ্ছা অনুমোদন করি। আক্ষেপের বিষয় এই যে বাপু তুমি সভার স্থানটা কোথায় তাহা উল্লেখ কর নাই, তাহা হইলে এই বুড়ো বয়সে খরচের কাগজে চিঠী লিখিয়া আর লোক হাসাইতাম না, একেবারে সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করিতাম।

সত্যি বাপু! তরকারির জ্বালায়, আর কাহার কিছু হোক বা না হোক, তোমার পিসিমার মত অভাগিনীদের প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পতি নাই, পুত্র নাই, সংসারের কোন সুখ দুঃখের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, পূজা অর্চ্চা ইষ্টমন্ত্র জপ ইত্যাদিই জীবনের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বাছা! পূজা অর্চ্চা করিব কি, রন্ধনশালা হইতে এক মুহূর্ত্তও আমার অবসর নাই। বাপু! কানাই ঠেলিতে ঠেলিতে যখন মাথার ঘাম পায় পড়ে, একাদশীর দিনে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, তখন চক্ষু বুজিয়া এক এক বার ভাবি যে বিধবা পিসিগুলো ম'রে বিষ্ণুপুরে বামুণ হয়, না বিষ্ণুপুরে বামুনগুলো ম'রে বিধবা পিসি মাসি হয়।

বাপু, যে বাড়ীতে আমার বাস, তথায় স্ত্রীলোক যে আর কেহ নাই তাহা নহে; তা শত্রুমুখে ছাই দিয়ে ৩টি বউ আছেন; কিন্তু রাঁধিবার বেলা তাঁহাদের ফুরসৎ হয় না। উল বুনিতে কেতাব পড়িতে, কাপড় পরিতে চুল বাঁধিতে, ঘর সাজাতে আর মিনিটে মিনিটে আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতেই তাঁহাদের সময় যায়। ভাতবেড়ে অনেকবার ডাকাডাকি করিলে তাঁহারা আহার করিতে আসেন। পরিবার মধ্যে বেটের কোলে ৮।১০টি লোক—কিন্তু রন্ধনকার্য্যের সমস্ত ভারটাই অভাগিনীর উপর! এমন অবস্থায়, বাপুরে, আমি আর পেরে উঠিনে—একদিন দুদিন নয় বারমাস, ত্রিশদিন দুই বেলা—কাহার সাধ্য? তাহার উপর আবার বুড়ো হ'য়ে প'ড়িছি। বাপু তোমার হাতে ধরি, মহিলা সভায় তোমার হোয়েছে আমাকে পত্রদ্বারা লিখিও, আমি

* সংখ্যা পূর্ণা দেখ —পা, স, স।

তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া তাহার শ্রবণাপন্ন হইব!

তরকারিটা উঠিয়া গেলে তবু অনেকটা শ্রমের লাঘব হয়। বাকি থাকিবে ভাত—তা' ক্রমশঃ দেখা যাবে, তরকারি উঠে গেলে ভাত উঠ্‌তে আর ক দিন লাগ্‌বে?

রন্ধিত মাছ তরকারি উঠিয়া গিয়া সভার প্রস্তাব মত চাট্‌নি এবং মোরব্বা এবং শুঁটকি মাছ ইত্যাদি প্রচলিত হইলে উপস্থিত গোটা কতক মস্‌কিল হইবে দেখিতেছি। প্রথম ত, জাতি যাইবে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? কেন না, আমরা বুড়ো থুড়ো হ'য়ছি, আর কত দিনই বা থাকিব? তার পর তোমরা কি করিবে, কে দেখ্‌তে আস্‌বে? যা' মনে আছে বাবা তাহা কর—কারও কথা শুন না।

শ্রাদ্ধ শান্তি কর্ম্ম কাজ গুলো উঠে গেলে এক রকম মন্দ নয়, অনেক ল্যাঠা মিটে যাবে। কিন্তু বাবা, একটা কথা বলে দিই, মনে রেখ; যেন তোমার পিসিমার শ্রাদ্ধের সময় শুঁটকি মাছ দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইও না! তদপেক্ষা গয়ায় একটা পিণ্ড দিয়া দিও—কোন গোল থাকিবে না। যত লোক মরিবে, তত পিণ্ড দেওয়াও একটা মহা মস্‌কিলের কথা বটে, তা আমি বলি, তোমরা বরং এক কর্ম্ম কর; তোমরা বঙ্গ দেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জনকতক লোক—স্ত্রীপুরুষ একত্রে গয়ায় গিয়া সমগ্র বাঙ্গালীজাতির অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকাল স্মরণ করিয়া একটা 'সাপটা' বড় রকমের পিণ্ড দিয়া ফেল—সমস্ত ল্যাঠা একেবারেই চুকে যায়!

তরকারি উঠে গেলে আর এক ভাবনা তোমাদেরই বল। সেবিকার সভায় যেরূপ অভিপ্রায় তাহাতে এক আলুভাতে ভিন্ন বাছা তোমাদের কপালে আর কিছু হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি, আমার মাথায় যত পাকা চুল তত বৎসর তোমাদের পরমায়ু হউক, কিন্তু বাবা! একে বাঙ্গালি, তাতে কেবল আলু ভাতে ভাত, কি করিয়া যে তোমাদের প্রাণ রক্ষা হইবে তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। তোমরা বাছা বাহিরে বক্তৃতা লাফালাফি অনেক কর বটে, কিন্তু বাড়ীতে আমার বধূমাতাদিগের সম্মুখে তোমরা কেঁচো, অতএব তোমরা যে ঘাড় গুঁজে বিনাবাক্যব্যয়ে কেবল আলুভাতে ভাতই খাইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তা' হ'লে তোমরা বাঁচিবে কি প্রকারে? কিন্তু বাবা! কথায় বলে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' আমি ত এখন বাঁচি—তরকারি খাওয়া উঠে যাক তার পর মা দুর্গা তোমাদের রক্ষা করিবেন।

মহিলা সভার ঠিকানাটা বাপু পত্রপাঠ আমাকে লিখিও আর না হয় আমার এই পত্রখানা সেই সভায় পাঠাইয়া দিও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ঐ সভায় যে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম লিখিয়াছ—'মন্দাকিনী,' 'লবঙ্গলতা ভট্টাচার্য্য,' 'সন্তোষিণী' পাল ন্যায়বাগীশ এম, এ—'ইঁহারা কি স্ত্রীলোক না পুরুষ মানুষ? দুটো সন্দেহ হইয়াছে—একটা এই যে ব্রাহ্মণ ন্যায়বাগীশ শুনিছি, কিন্তু 'পাল ন্যায়বাগীশ' কখন শুনিনি! আর একটা সন্দেহ এই যে 'সন্তোষিণী' স্ত্রীলোকের নাম; স্ত্রীলোক ন্যায়বাগীশ কি করিয়া হইবে? বাবা, আমি সেকেলে বুড়ী, এ সব কথার অর্থ কিছু বুঝি না। আমার পিতা নন্দ ন্যায়বাগীশ ছিলেন, আর আমাদের পাড়ায় একজন

শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন আর দুজনেই পুরুষ মানুষ ছিলেন, কিন্তু 'সন্তোষিণী পাল ন্যায়বাগীশ' এ আবার কি কথা? পত্রে সব কথা ভাল করিয়া খুলিয়া লিখিও ইতি আশীর্ব্বাদ পত্র, তারিখ ১লা ফাল্গুন

তোমাদের বৃদ্ধা পিসিমা।

বিহারের প্রাচীন ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের অব্যবহিত নিম্নেই এক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহাদিগকে মনুষ্য ও পশু সকলের চিকিৎসা করিতে হইত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ই প্রধানছিল। চিকিৎসক ব্যতীত মেষপালক, পরিদর্শক ও রাজকর্ম্মচারী এই তিন শ্রেণীর কথা ও মেগাস্থেনিস উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা যে পৃথক পৃথক্ তিনটী জাতি ছিল, এমন বোধ হয় না, কেন না দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণেরাও পরিদর্শক ও রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইতেন।

ব্যাধেরা মেষপালকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইত। ব্যাধ বা মেষপালকদিগকে হিন্দু বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা কোন স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত না; নানা স্থানে অনেকে কিছুদিনের জন্য একত্র বাস করিয়া আবার স্থানান্তরে বসতি করিত। বোধ হয় তাহারা তাতার দেশ হইতে প্রথমে আসিয়াছিল। ব্যাধেরা পালিত মেষও শীকারলব্ধ বন্যপশু বধ করিয়া উহাদিগের মাংস বিক্রয় করিত। যে সকল আরণ্যপশু বা পক্ষী শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া শস্য হানি করিত তাহাদিগকে বধ করাই ব্যাধদিগের প্রধান কার্য্য ছিল। এই কার্য্যের জন্য তাহারা রাজভাণ্ডার হইতে পুরস্কারস্বরূপ ধান্য ও গোধুম প্রাপ্ত হইত।

রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিদর্শকদিগের দ্বারা শাসিত হইত। পরিদর্শকগণ নগর শিবির ও প্রদেশে প্রেরিত হইত। তাহাদিগকে কিয়দংশে চরের কার্য্যও করিতে হইত। রাজ্যের নানা স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাজসভায় বিজ্ঞাপিত করা তাহাদিগের কার্য্য ছিল। এক্ষণে তারযোগে বা সংবাদ পত্রের দ্বারা যে প্রকার সংবাদ অবগত হইতে পারা যায় প্রাচীনকালে সে প্রকার কোন উপায় না থাকাতে, রাজাকে চর নিয়োগ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত। এই সকল চরেরাই প্রাচীনকালে রাজার বিপক্ষে সচরাচর ষড়যন্ত্র হইত, কিন্তু তাহা অবগত হইবার কোন উপায় না থাকাতে কাজেই রাজাকে এই প্রকার বহুসংখ্যক চর নিযুক্ত করিতে হইত।

নগর পরিদর্শকগণ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচজন করিয়া

লোক নিযুক্ত থাকিত। প্রথম শ্রেণীর পরিদর্শকেরা শিল্পজাত দ্রব্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। পুরাতন সামগ্রী নূতন বলিয়া অথবা মন্দ দ্রব্য ভাল বলিয়া কেহ যাহা কেহ বিক্রয় না করে তৎপরিদর্শন করা দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিদর্শকের কার্য্য ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর পরিদর্শকেরা রাজসংসারের এক প্রকার দালাল ছিলেন। কৃষকদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া যে শস্য উদ্বৃত্ত হইত তৎ সমস্ত তাঁহাদিগের দ্বারা রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ও পরে ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় জন্য প্রদত্ত হইত। তাঁহারা বাজারের পরিমাণ স্থির করিয়া দিতেন এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ শুল্ক না পাইলে তাহা বিক্রয় করিতে দিতেন না। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা এই সকল শুল্ক নির্দ্ধারণ ও সংগ্রহ করিতেন। ব্যবসায়ীদিগকে প্রায়ই লাভের দশমাংশ কর দিতে হইত। এই কর সংগ্রহের নিয়ম বড় কঠিন ছিল। কোন ব্যক্তি কর সম্বন্ধে কোন প্রতারণা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। পঞ্চম শ্রেণীর পরিদর্শকেরা রাজ্যমধ্যে জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখিতেন। তাঁহাদিগের হিসাব অনুসারেই ব্যক্তি প্রতি কর ধার্য্য হইত। ষষ্ঠ শ্রেণীর পরিদর্শকেরা বিদেশীয় আগন্তুক, দূত ও ভ্রমণকারীদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদিগের জন্য বাসস্থান নির্দ্ধারণ, ভৃত্য নিয়োগ ও তাঁহাদিগের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য স্থির করা, এই শ্রেণীর লোকের কার্য্য ছিল। কোন বিদেশীয় ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার চিকিৎসা ও উত্তমরূপ পরিচর্য্যা হইত এবং মৃত্যু হইলে যথাবিধি সৎকার ও হইত।

শিবির ও সেনার তত্ত্বাবধারণের জন্যও ছয় শ্রেণীর পরিদর্শক ছিল। তাহারাও প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচজন করিয়া থাকিত। এক শ্রেণীর উপর রাজকীয় নৌ বিভাগের ভার ছিল। নৌকা গঠন ও সংস্কার এবং জলপথে দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য তাহারা পর্য্যবেক্ষণ করিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা স্থলপথে পশু ও শকটদ্বারা দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি পরিদর্শন করিতেন। সৈনিক বিভাগের অস্ত্র শস্ত্র, আহারীয় সামগ্রী ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠান বা আনয়ন তাহাদিগের কার্য্য ছিল। পদাতি সেনার প্রয়োজন সাধন জন্য তৃতীয় শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকিত। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা অশ্বারোহী সেনার তত্ত্বাবধান করিত। রথ ও সারথির ভার পঞ্চম শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকিত। ষষ্ঠ শ্রেণীর পরিদর্শকেরা হস্তী ও অপর সামরিক পশুর তত্ত্বাবধান করিত। সকল প্রকারেই ব্যবস্থার এরূপ পারিপাট্য ছিল যে, এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে কখন অন্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীর কর্ম্মে নিয়োগ করিতে হইত না।

রাজধানী হইতে দূরস্থিত প্রদেশ বা পল্লী সমূহে কি প্রকার কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে মেগাস্থেনিস্ প্রায় কিছুই লেখেন নাই। তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিতেন, সুতরাং তথাকার অবস্থাই বিশেষ অবগত ছিলেন। তথাপি বলিয়াছেন যে, মফঃস্বলে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী থাকিতেন তাঁহারা বন্যায় কি প্রকারে প্রজা রক্ষা হয় তাহারই তত্ত্বাবধান করিতেন। কতকগুলি কর্ম্মচারী কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। অপর কতকগুলি শস্যক্ষেত্র সমুদায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক শ্রেণীর লোক রাজপথ নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকিত। রাজপথের স্থানে স্থানে স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত এবং অর্দ্ধক্রোশ অন্তর একটী করিয়া প্রস্তর (Mile stone) প্রোথিত ছিল।

মেগাস্থেনিস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গেছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তাঁহার রাজ্যের লোক পরমসুখে কালযাপন করিত। আমরা যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম তৎসমস্তই বর্ত্তমান সভ্যতার চিহ্ন। গ্রীক গ্রন্থকার আরিয়ান, ষ্ট্রাবো ও মেগাস্থেনিসের গ্রন্থে এ সমস্ত বিষয়ের যথাযোগ্য বর্ণনা আছে। আমরা কেবল সংক্ষেপে উহার উল্লেখমাত্র করিলাম। এক্ষণে যে সকল ব্যবস্থা সভ্যতার ফল বলিয়া পরিগণিত, তাহা প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল এবং তৎপ্রভাবে লোকে পরমসুখে কালযাপন করিত। এক্ষণে সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। আমরা এক্ষণে সকল বিষয়েই ইউরোপীয়ের মুখাপেক্ষী, তাঁহারা আহার না দিলে উপবাসী থাকিতে হয়। ভারতের পরিণামে এত ছিল ইহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই।

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য।

ক্রমশঃ—

পরলোক।

(প্রতিবাদ)

বিগত ১২৯০ শকের চৈত্র মাসের ২য় পক্ষের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যা পাক্ষিক সমালোচকে 'পরলোক' শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে পরলোক বিশ্বাসভিত্তিকে লেখক মহাশয় কল্পনাপ্রসূত মানব মস্তিষ্ক বিলোড়নের কাল্পনিক সাময়িকভাব সকলের বিকাশ বলিয়া বোধ করিয়াছেন। তাঁহার উগ্র গবেষণায় তিনি বেদকে মিথ্যা করিতে চাহেন, পুরাণ ও ইতিহাস সকলকে চূর্ণ ও বিচূর্ণ করিতে চাহেন এবং পরম্পরাগত বিশ্বাস ও শ্রুতি (Traditions) সকলকে অসার-সর্ব্বস্ব কদলীবৃক্ষের ন্যায় কতকগুলি উপকথা-ব্যঞ্জক বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন। পরলোক বলিলে সাধারণতঃ মৃত্যুর পর হইতে যে কালাবস্থ তাহাই বুঝিতে হইবেক। মানিলাম যে একটি আত্মা পরমাত্মার আংশিকভাবে তাঁহার ইচ্ছাতে সংসারে আসিল, লীলা করিল, ইহজীবনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি কতক পরিমাণে সাধন করিল, সুখ দুঃখময় অবস্থায় বিচরণ করিল ও পরিশেষে এই জগত ত্যাগ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। কিন্তু মনুষ্যের বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থার ভাব দেখিলে, তাঁহার সামর্থ্যাসামর্থ্য, নৈরাশ ও সুখের অবস্থা দেখিলে, তিনি যে একটি পরিমিত গুণ ও শক্তিসম্পন্ন জীব তাহা সহজেই প্রতীত হয়। তবে একটি পরিমিত

বুদ্ধি ও শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া দিনকতক অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ ও পশুবধ দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া, ঈশ্বর মানবকে যে সমস্ত অপরিসীম বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার অপরিণত অবস্থাতেই, ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেই যে তাহার আত্মা পরমাত্মায় সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইবে ইহা অসম্ভব। যদি সংসার সৃষ্টির কিছু উদ্দেশ্য থাকে, যদি একটি বালু কাকণা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কোন অসাধারণ প্রয়োজন সাধন জন্য হয়, যদি এই অসংখ্য সৌরজগতের সৃষ্টিশৃঙ্খলায় কোন মহান্ পুরুষের জ্ঞান, যত্ন, মনোযোগ ও অনিমেষ দৃষ্টির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেকাদি উৎকৃষ্টবৃত্তি নিচয়ের সম্যক পরিস্ফুট অবস্থা কেবল পরকালেই লভ্য ইহার অন্যথায় বিবেক ও যুক্তির মর্য্যাদা এবং ঈশ্বরের অনন্তত্ব রক্ষা পায় না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সত্য দ্বারা ইহা প্রমাণীত হইতেছে যে বিয়োগের পরিণতি যোগ, হ্রাসের পরিণতি বৃদ্ধিতে হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ সৃষ্টির মূল প্রকৃতিগত, সুতরাং যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের পরিমিত আত্মা পরমাত্মায় পূর্ণ বিকাশ না পায় সে পর্য্যন্ত তাহাকে নানা প্রকার অভাব ও দুর্ব্বলতার মধ্যে থাকিয়া ক্রমোন্নতি করিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিবেক ও আত্ম-প্রত্যয় বলে যাঁহাকে পূর্ণ, নিত্য ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, তাঁহার অসীম, সুন্দর, অনন্তরাজ্যের সুবিস্তৃত পথে ক্রীড়াশীল আত্মার মৃত্যুপরে পরমোৎকর্ষ লাভ জন্য নবভাবে নব অবস্থায় ভ্রমণ করিতে বাধা বা ভয়ের বিষয় কি? অনন্তের অনন্ত মহীমাকে কয়েক বৎসরের (৪০ কি ৫০) পরিমিত সীমায় আবদ্ধ না করিয়া সহস্র সহস্র কিম্বা অপরিমিত বৎসরে কিম্বা যুগে বিস্তৃত করিলে যুক্তিবহির্ভূত হয় না।—এইরূপ পরলোকভিত্তি মূলক সহস্র সহস্র যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

২। লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ঈশ্বর সৃষ্টির সময়ে কোন মনুষ্যের সহিত শাস্ত্র কি পুরাণ প্রেরণ করেন নাই। আমি বলি তিনি—শাস্ত্র ও পুরাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রেরণ করিয়াছেন। এই শাস্ত্র কি? ইহা বিবেক প্রসূত সত্য সমষ্টি। আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আমি জাগরিত হইয়াছি, ইহা আমি কিরূপে অনুধাবন করিতেছি? এ জ্ঞানকে কি লেখক মহাশয় কল্পনা করিবেন? নিদ্রা হইবামাত্র যে বুদ্ধি ও বিবেকের কার্য্য অপরিস্ফুটরূপে আপনাআপনি হইয়া থাকে, যে বুদ্ধিবৃত্তির অব্যর্থ উপদেশ বন্ধুরূপী হইয়া মনুষ্যকে উত্তর জীবনে শঙ্কট সঙ্কল সংসারে রক্ষা করে ও ন্যায়ান্যায়ের পথ দেখাইয়া দেয়, সেই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকই কেবল মনুষ্যকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। এই সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ও বিবেকাদেশ সকলই পুরাণাদি শাস্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে। আমি এক সপ্তাহ হইল মেকলে সাহেবের রচনা (Macaulay's Essays) পড়িয়াছিলাম, অদ্য একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে আমার ইচ্ছা হইল যে মেকলে সাহেবের রচনা পঠিত একটি উত্তম ইংরাজি শব্দ (Idiomatic English) প্রবন্ধস্থ করিয়া আমার লিখিত বিষয়টীকে অপেক্ষাকৃত সারবান করিব, কিন্তু অনেক চিন্তা করিলাম কিছুতেই সেই শব্দ স্মৃতিপথারূঢ় হইল না—

এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা পরে অত্যন্ত চিন্তাবেগে সেই স্মৃতিভ্রষ্ট শব্দটী আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। লেখক মহাশয় বলিতে পারেন কি উপায়ে, মস্তিষ্কের কোন স্থানে মনের কোন প্রকৃতির সংঘাত দ্বারা এই স্মৃতিভ্রষ্ট শব্দটি স্মৃতিপথারূঢ় হইল? এইরূপ কতকগুলি সুদূরব্যাপ্ত আধ্যাত্মিক নিয়মে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান আমাদের বিবেক-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্র শব্দে কতকগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত কাগজকে বুঝা উচিত নহে।

৩। পাপ পুণ্য চিন্তা ইহ-পারলৌকিক গতিবিধি ও আত্মার ক্রমবিকাশের বিজ্ঞাপন চিহ্ন নহে ইহা কিরূপে লেখক মহাশয় স্থির করিয়াছেন? বিবেকের সূক্ষ্মগতিতেই কেবল পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে। একটি মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক শক্তি হইতে স্বতন্ত্র করিলে তিনি পশুজীবনে কিম্বা জড়ধর্ম্মে পরিণত হইবেন। তিনি যতক্ষণ বিবেক ও বুদ্ধিজীবি ততক্ষণ তিনি মনুষ্য নাম-বাচ্য, কিন্তু এই বিবেক ও বুদ্ধি আবার চিন্ময় আত্মাকে কর্ত্তারূপে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং পাপ পুণ্য বিচার ও সিদ্ধান্তকে সূক্ষ্মরূপে আত্মারই সিদ্ধান্ত বলিতে হইবেক ইহা প্রমাণীত হইল এবং এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্যই আত্মার পুণোৎকর্ষ অবস্থাকে নিকটস্থ ও দূরস্থ করে।

৪। লেখক মহাশয় কহেন বিবেকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত তাহাই পাপ, যাহা পবিত্র ও আনন্দজনক তাহা পুণ্য এবং এবং এই সকল পাপ পুণ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য একমাত্র সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতা রক্ষা মাত্র। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে যে যাহা বিবেক সিদ্ধ তাহা আত্মারও অনুমোদিত ও তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। যদি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাই মুখ্য কল্পে ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়, তবে মনুষ্যকে পারলৌকিক ভয় দেখাইয়া অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার কি প্রয়োজন? শুদ্ধ শারীরিক দণ্ডবিধান দ্বারা ইহজীবনের উদ্দেশ্য সফল হইত। যদি বল মনুষ্য গোপনে অসৎকার্য্য করিয়া রাজ-শাসনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে এইজন্য পারলৌকিক ভয় প্রদর্শন প্রয়োজন হয়। আমি বলি এই প্রকার অনুভব ভ্রমসঙ্কুল। কারণ এরূপ হইলে ঈশ্বর মানবাত্মাতে পাপ পুণ্য করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি না দিয়াই এই সংসারে প্রেরণ করিতেন। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে এই সংসার রঙ্গভূমিতে মনুষ্যের নৃত্য কুন্দন, স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই ঐশ্বরিক নিয়মাধীন, যখন দেখিতেছি যে এইসংসার রঙ্গভূমি আমাদের পরীক্ষাস্থান মাত্র, যখন দেখিতেছি যে আমার হস্ত উত্তোলনের জন্য বায়ু মধ্যস্থ পরমাণু (Molecules of air)সকলের সংঘাত বিঘাত দ্বারা আমার অভাবনীয় একটি কার্য্য শূন্যে সংঘটিত হইল, তখন যে আমার হস্ত কৃত অন্যায় কার্য্য সকল সমাজ শৃঙ্খলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ কার্য্যের প্রবর্ত্তক মনাদি বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতিকে কলুষিত করিয়া আমার আত্মার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাকে অপলাভ করিবে না একথা কে বলিতে সাহসী হইবেন? ইহ জীবনের সুখ ও সামাজিক সুখসম্পত্তিই সর্ব্বস্ব হইলে পশু জীবনে, পশু ভাবের সহিত মনুষ্য জীবনে এবং মনুষ্যভাবে কিছুই তারতম্য লক্ষিত হইত না।

৫। আর একটি কথা। পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্য

কলাপ ইহজীবনের সদসৎ অবস্থার অত্যন্ত প্রতিপোষক হইয়া থাকে। মনে কর পঞ্চম বৎসরের সময়ে দুইটি বালকের হস্তে খড়ি (হাতে খড়ি) দেওয়া হইল, অসাধারণ মেধা প্রভাবে প্রথমটী সমগ্র ব্যঞ্জনাদি বর্ণকে একেবারে আয়ত্ত করিল, অপরটি স্বীয় স্থূল বুদ্ধির দোষে শিক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিল না। কয়টি লোকে বুদ্ধিগত এই তারতম্যের গূঢ়রহস্যভেদ করিতে পারেন? পরলোক মানিতে হইলে যে ভারতবর্ষের লোককে মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষেই জন্মাইতে হইবেক এমন কোন লেখা পড়া নাই—অনন্তের পুত্র জীবাত্মার উৎকর্ষ জন্য অনন্ত বিস্তৃত পথ অযুত লোকে প্রসারিত রহিয়াছে। পরমোৎকর্ষ লাভান্তর, আনন্দের উপর আনন্দ লাভান্তর, চরমে পরমাত্মায়, জীবাত্মায়, পিতা পুত্রে সম্পূর্ণ মিলন হইবে।

'নানা মুনির নানা মত,' ইহা স্ত্রীলোক ব্যবহৃত একটা স্থূল কথা। শাস্ত্র সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে নানা মুনির একমত। কেবল অধিকার-ভেদে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। পারলৌকিক বিষয় আধ্যাত্মিক জগতের অন্তর্গত, সুতরাং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিবেক ও আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়াছে এই জন্য পারলৌকিক বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে, বিবেক ও আত্ম প্রত্যয়কে (Intuition) পোষণ করিতে হইবেক। তবে যদি বলপূর্ব্বক ঈশ্বর মানিনা ও পরলোক মানিনা কহ তবে নাচার। লেখক মহাশয় যে যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য পরলোক বিশ্বাসও সেই যুক্তির অন্তর্গত।

হিন্দুশাস্ত্র সমর্থিত পরলোক বিষয়ক যুক্তি সকলকে উপেক্ষা করিয়া একটি ইংরাজি গ্রন্থকারের কথাকে—Life is but a walking shadow এ কল্পনা না বলিয়া ধ্রুব সত্য বলিয়া লেখক মহাশয় কিরূপে বুঝিয়াছেন তাহা বুঝা আমাদের অসাধ্য।

শ্রীরসিকলাল রায়।

অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য।

দিন দিন বঙ্গ ভাষার প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে ক্ষীণ প্রাণ বঙ্গবাসীর উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় উন্নতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সকল দেশে এই কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। যদি বঙ্গবাসী কোনদিন জগতের উন্নত জাতিদিগেরমধ্যে আসন পরিগ্রহে সমর্থ হয়, বঙ্গভাষার উন্নতিই তাহার প্রধান

কারণ হইবে সন্দেহ নাই। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনাই স্বল্পবাল মধ্যে বঙ্গভাষার এবম্ভূত প্রসার বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। সুবিপুল ইংরাজীভাষা দুই হস্তে ধনরত্ন বর্ষণ করিতেছে, আর বঙ্গবাসী ক্রমে তাহাই কুড়াইয়া লইতেছে। কিন্তু এই অসামান্য সুযোগ প্রাপ্তি সত্ত্বেও বিগত দ্বিশতি বর্ষ মধ্যে বঙ্গভাষা যেরূপ ক্ষিপ্রবেগে উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইয়াছে, ভারতের অপরাপর ভাষা তাঁহার শতাংশও করিতে সমর্থ হয় নাই। মহারাষ্ট্রী, তামিল, গুজরাটী প্রভৃতি সমস্ত ভাষাই নির্জ্জীব, আর আমাদের মাতৃভাষা দিন দিন উপচীয়মান। ইহা কি সামান্য সুখের বিষয়। বঙ্গবাসী অনুকরণকারী সত্য, কিন্তু সময় বিশেষে উৎকৃষ্ট কার্য্যের অনুকরণে লোক বড় হয় না। কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না। অনুকরণ স্পৃহা যদি উপযুক্ত পথে প্রধাবিত হয়, তবে কেন না লোকের উন্নতি হইবে? সে যাহা হউক, বঙ্গভাষার এই উন্নতির সময়ে ইহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলে বোধ হয় বিজ্ঞ পাঠক সমাজ আমাদিগকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন না।

সকল ভাষাই প্রথমে পয়ার পদ্যে বিকাশ পাইয়াছে। বঙ্গভাষাও এই চিরন্তন প্রথার অন্যথাচরণ করিতে পারে নাই। প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলে উহাকে আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন ভেদে তিন কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু অদ্য আমরা আদ্য ও মধ্যকাল সম্বন্ধে অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া ইদানীন্তনী বঙ্গভাষা সম্বন্ধে গুটীকত কথা বলিব। বাঙ্গালার প্রথম যুগে সুধু পদ্যেরই অনুশীলন হইত। তৎকালে গদ্য লিখিলেও কেহ তাহার বিশেষ আদর করিত না, সুতরাং সকলেই পদ্য লিখিতে সচেষ্ট হইত। প্রথমতঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের ছন্দানুবর্ত্তনে বাঙ্গালায় পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ঘণরাম, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভাষাবিশারদগণ নানাবিধ পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

বঙ্গভাষার দ্বিতীয় যুগে প্রথমতঃ পুরুষ পরীক্ষা, প্রবোধ চন্দ্রিকা প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হয়। তদনন্তর নিঃস্বার্থ পরোপকারী দেশহিতৈষী পাদরী মার্সম্যান ও কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, পণ্ডিতাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রসিদ্ধ নাটককার দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত, ইংরেজী এবং অপরাপর ভাষা অবলম্বনে গদ্য গ্রন্থ প্রকটিত করিয়া বাঙ্গালার এক নূতন অবয়ব প্রদান করেন। বাঙ্গালা তখন কথা কহিতে শিখিল, এবং নানাবিধ সুমধুর শব্দে পরের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল! উল্লিখিত মহাত্মাদিগের নিকট বাঙ্গালাভাষা চিরকালের তরে ঋণী রহিয়াছে। যাঁহারা এক্ষণে বাঙ্গালার সবিশেষ উন্নতি সংসাধন করিয়া এবং বাঙ্গালাভাষার বর্ত্তমান সমুজ্জ্বল বেশ সম্পাদন

করিয়া প্রাগুক্ত লেখকগণের নিন্দা অথবা আশ ঘোষণা করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত ভ্রমপ্রমাদে নিপতিত তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বাস্তবিক সেই সময়ে বঙ্গভাষার যতদূর উন্নতি হওয়া সম্ভব, ইঁহারা প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। সুতরাং সকলেরই ইঁহাদিগের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালার তৃতীয় যুগ অথবা ইদানীন্তন কালে অবতরণ করিলাম। উনবিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব্ব উন্নতিতে চিরদিনের উপেক্ষিতা বাঙ্গালাভাষা যুগান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। আজ বঙ্গভাষা, ভাষা মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা এখন নানা অলঙ্কারে সমালঙ্কৃতা, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিতা হইয়া যৌবন সোপানে দণ্ডায়মানা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আমাদিগের এই মাতৃভাষাকে নানাবিধ নূতন নূতন বেশ ভূষা প্রদান করিতেছেন, যাঁহারা উহার হৃদয়ে নানা অভিনব রসের তরঙ্গ তুলিতেছেন, যাঁহাদিগের অপরিসীম যত্ন, আয়াস ও অধ্যবসায়ে বঙ্গভাষা এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত সভ্যজগতের বিস্ময়োৎপাদক হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অদ্য আমরা স্বনাম প্রসিদ্ধ বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতেছি। ইহাঁদিগের অসামান্য যত্ন ও পরিশ্রমে বাঙ্গালার বিস্তর বৈভব বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং উহা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন হইয়া প্রায় অন্যান্য সমস্ত ভাষার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কবিদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয় খ্যাতনামা মৃত মহাকবি মধুসূদন, কবিবর হেমচন্দ্র ও আয়ুষ্মান নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

বঙ্গদর্শন ও বান্ধব সম্পাদক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের দুই প্রধান নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনের প্রচার হইতেই আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের খরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গ দর্শন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি কান্তিবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া বাঙ্গালী অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বঙ্কিম বাবু অসামান্য চিত্রনৈপুণ্য, শ্রুতিমধুর সুললিত পদবিন্যাস, মনোহর গল্পের অবতারণা, দুর্ব্বোধ্য দুরূহ বিষয়ের প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবর্ণনা এবং কল্পনার অনুপম লীলাখেলা প্রদর্শন করিতে কীদৃশ পটু, তাহা বঙ্গভাষানুধ্যায়ী ব্যক্তিমাত্রেই সম্যক অবগত আছেন। পক্ষান্তরে বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষও হৃদয়ের অন্তঃগূঢ় গভীর ভাব সমূহ উদ্ঘোষিত করিতে, তেজস্বিতা সহকারে লোকের মন উত্তেজিত করিতে, এবং ভাষায় তাড়িতবেগ সঞ্চালন করিতে

তাদৃশ দক্ষ ও সমর্থ। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচরণশীল এবং উভয়েরই গতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তথাপি বঙ্কিম বাবুর সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর এক বিষয়ে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। গদ্য সাহিত্যে কবিতা লিখিতে উভয়েই তুল্যরূপে সক্ষম। বঙ্কিম বাবু স্বকীয় উপন্যাসনিচয়ে নানাবিধ ভঙ্গীতে সময়ে সময়ে যেরূপ কবিতা লিখিয়া থাকেন, কালীপ্রসন্ন বাবুর উচ্চতর গম্ভীর বিষয়ের মধ্যে ও তাদৃশ কবিতার সম্যক বিস্ফূরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের মতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে কবিতা লিখিতে কেবলমাত্র এই উভয়েই দক্ষ ও সমর্থ। বাঙ্গালায় অন্য যে সকল লেখক ইহাঁদিগের আদর্শ অবলম্বনপূর্ব্বক আজি কালি গদ্য সাহিত্যে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অদ্যাপি এত ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতে সমর্থ হয়েন নাই। ফলতঃ বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষার নূতন অবয়ব প্রদান করিয়াছেন এবং কালীপ্রসন্ন বাবু উহাতে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সঞ্জীবনী শক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন। অনেকে বঙ্কিম বাবুকে বাঙ্গালার সার্‌ওয়াল্টার স্কট এবং কালীপ্রসন্ন বাবুকে বঙ্গীয় মেকলে নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এই অতিবাদের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিম বাবু ও কালীপ্রসন্ন বাবু উভয়েই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু এই বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহারা যাহা নহেন, তাদৃশ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করি না। ইংরেজ লেখকগণের মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতা আয়ত্ত করিতে বাঙ্গালীর অনেক যুগ বহিয়া যাইবে। এখন আমরা ইংরাজের প্রসাদভোগী। তাঁহাদিগের প্রদত্ত অন্নে আমাদিগের ভাষার কলেবর পরিপুষ্ট হইতেছে, এজন্য ইংরেজ জাতির নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা করা উচিত নহে।

বঙ্কিম বাবু ও কালীপ্রসন্ন বাবুর পরে বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম আমরা আর্য্যদর্শন সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণের নামোল্লেখ করিতেছি। বাবু যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে অসামান্য স্বজাতিবাৎসল্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্তান্ত ও হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। তিনি যে উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। যোগেন্দ্র বাবুর ভাষা পরিশুদ্ধ, সুমিষ্ট, ওজস্বিনী ও সরল। যোগেন্দ্র বাবুর ভাষা, বঙ্কিম বাবু ও কালীপ্রসন্ন বাবুর ভাষার মধ্যবর্ত্তিনী। ভরসা হয়, কালে যোগেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালাই উৎকৃষ্ট বাঙ্গালার আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। মহৎ জীবনের আখ্যায়িকা পাঠ করিলে মানবের মন মহত্তর হইতে ইচ্ছা করে। এজন্য যোগেন্দ্র বাবু ক্রমান্বয়ে বঙ্গভাষায় ইউরোপীয় সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রকটিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষ্টুয়ার্ট মিল, মৃত মহাত্মা জোসেফ ম্যাটসিনি ও বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। এরূপে পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষার কলেবর যে বিস্তর পরিবর্দ্ধিত হইবে, তদ্বিষয় অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ—

শ্রীরাজবিহারী দাস।

কর্ত্তব্য পালন।

সময়—ঘোর তমসাবগুণ্ঠনী, স্থান—গঙ্গা তীরস্থ বিকট শ্মশান। সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত জগৎবাসী সমস্ত জীব জন্তু নিদ্রায় নিস্তব্ধ। কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ এই ভয়ঙ্কর শ্মশান ভূমি স্থানে স্থানে নির্ব্বাপিত প্রায় চিতাগ্নিকর্ত্তৃক ঈষৎ আলোকিত, আর যদিও সর্ব্বথা ইহা নিস্তব্ধ তথাপি শব মাংসলোলুপ শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট চীৎকার করিয়া থাকিয়া ইহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন সময়ে একটি রমণী—রুক্ষকেশা মলিনবস্ত্র পরিধিতা একটি দুঃখিনী রমণী উক্ত শ্মশানভূমিতে উপবিষ্টা, তাহার ক্রোড়ে তাহার মৃত পুত্র, পুত্রের প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়াছে, তাহার শ্রীহীন জড় অস্বাভাবিকরূপ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র দেহটি মাতৃক্রোড়ে পড়িয়া আছে, তাহার মুখ বিকট, তাহার চক্ষু নিষ্পন্দ, অভিপ্রায়বিহীন হইয়া যেন কোথায় কোনদিকে তাকাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু রমণী একদৃষ্টে মৃত পুত্রের সেই বিকট মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তিনি অনেক কাঁদিয়াছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি অবশ হইয়াছেন, মনের ভিতর এখন একটী অমানুষিক অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হইয়াছে; আর কাঁদিবার তাহার প্রবৃত্তি নাই, আর কাঁদিবার তাঁহার ইচ্ছাও নাই; তিনি নিষ্পন্দভাবে অনিমেষনেত্রে মৃত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। রমণীর সম্মুখে—কিয়দ্দূরে একজন পুরুষ দণ্ডায়মান; পুরুষ বৃহৎকায়, তাহার মস্তকে একটি বৃহৎ পাগড়ী, এবং তাহার হস্তে একগাছি বৃহৎ [illegible]। সে কৃষ্টকায়, তাহার মুখমণ্ডল অজস্র শ্মশ্রু দ্বারা পরিবৃত। রমণীর বামভাগে একটি চিতা জ্বলিতেছে, কেহ এখনই শবদাহ করিয়া গিয়াছে, শব দাহন হইয়া গিয়াছে, চিতাগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই চিতাগ্নির আলোক শ্মশানভূমির নিরবচ্ছিন্ন তামস কিয়ৎপরিমাণে দূর করিতেছে, এবং তাহার আভা রমণী, তাহার মৃত পুত্র, এবং সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই ভীমরূপী পুরুষ—তিনেরই দেহে পতিত হইয়াছে। পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাছা, তুমি কে এখানে এরূপ অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছ?" রমণী উত্তর করিলেন—"বাপু, আমি দুঃখিনী রমণী; আমার এই একমাত্র পুত্র সর্পাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, ইহার সৎকার করিব, অর্থ সংগতি নাই, অনেক কষ্টে কতা গুলি অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ আহরণ করিয়াছি, কিন্তু আমার প্রাণসম এই পুত্ররত্নটি অগ্নিময় চিতায় প্রক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে একবার ইহার মুখখানি প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিয়া লইতেছি।" রমণীর অবস্থা দেখিয়া পুরুষও দুঃখিত, সে দুঃখ প্রকাশ করিল; কিন্তু বলিল—"বাছা, তোমার অবস্থা যেমনই হউক, প্রত্যেক চিতা পিছু আমি কিছু পয়সা লইয়া থাকি, তোমার পুত্রের শব দাহন করিবার পূর্ব্বে তোমাকে সেই পয়সা কয়টি আমাকে দিতে হইবে।" রমণীর নিকট একটিও পয়সা নাই, সুতরাং বিপদের উপর তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত। তিনি কাঁদিয়া বলিলেন—'বাছা, আমি বড় দুঃখিনী, পয়সা কোথায় পাইব? আমাকে

এই বিপদ হইতে তুমি উদ্ধার কর।' পুরুষ বড় দুঃখিত হইলেন, রমণীর একে এই শোচনীয় অবস্থা, তাহার উপর আবার তাহার বাক্যস্তি। তাহা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু তিনি বলিলেন—"যাহা তোমার অবস্থা দেখিয়া আর তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু আমি পরের চাকর, শ্মশানে এইরূপে পয়সা আদায় করাই আমার কর্ত্তব্য, যদি দয়া করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্মে পতিত হইব।" রমণী পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—'বাছা, আমি অসমর্থা, যে পয়সা প্রয়োজন, তুমিই আমাকে দান কর।' পুরুষ উত্তর করিলেন—'আমার এ জগতে আমার বলিবার কিছু নাই, ধন জন আমার নাই, স্ত্রীপুত্র পরিবার আমার নাই,—সমস্তই বিক্রীত, আমি নিজেও পরের ক্রীতদাস।' রমণী ব্যাকুলা হইয়া বলিলেন—'তবে কি করিব? কি হইবে?' পুরুষ অনেক ভাবিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন 'আমিই বা কি করিতে পারি? আমি সব সহ্য করিতে পারি, আমার কর্ত্তব্য আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না।' পুরুষের দৃঢ়ভাব দেখিয়া রমণী হতাশ্বাস হইলেন, উপস্থিত বিপদের পূর্ণ পরিমাণ তখন তাঁহার উপলব্ধি হইল, তাঁহার জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। তিনি শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, আর মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থ দণ্ডায়মান পুরুষ চমকিত হইলেন, তাঁহার আপাদ মস্তকে যেন বিদ্যুতের দারুণ বেগ প্রধাবিত হইল, যেন যুগযুগান্তর বিস্মৃত অনেক কথা একেবারে তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন কি জাগ্রত আছেন, সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন সত্য ঘটনা কিম্বা কল্পনা মাত্র, তাহা তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিস্মিত, স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, বজ্রাহত হইয়া সম্মুখস্থা মৃতপুত্রক্রোড়া রোরুদ্যমানা সেই রমণীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। *

পাঠক বলিতে পারেন—এই পুরুষ কে এবং এই রমণীই বা কে? এই পুরুষ স্বয়ং রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং এই রমণী তাঁহার মহিষী। সংসারে,—জগৎপিতা পরমেশ্বরের লীলাভূমি এই অচিন্তনীয় সংসারে কি না ঘটে? রাজা হরিশ্চন্দ্র—সুবিস্তৃত রাজ্যের যিনি অধিকারী, তিনি কি না শ্মশানঘাটের প্রহরী? আর তাঁহার মহিষী—যিনি রাজমহিষী, রাজার রাণী, তিনি কি না পরের কাঙ্গালিনী? এরূপ নিঃসহায়া, এরূপ শোচনীয় অবস্থায় তিনি উপনীতা, যে তাঁহার চক্ষুর মণি, অঞ্চলের নিধি, ক্রোড়ের ধন একমাত্র পুত্র—যে পুত্র রাজপুত্র, রাজার ছেলে—সে মরিয়াছে, তাহার শবদাহন করিতে এ জগতে তাঁহার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, স্বয়ং তাঁহাকেই সেই নিদারুণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে! মায়াময়, পরিবর্ত্তন শীল, বৈচিত্রপূর্ণ এই সংসারে অঘটনীয় কিছুই নাই!

কিন্তু পাঠক! এই মহান্, ভয়ানক, হৃদ্বিদারক, শ্মশান চিত্র দেখিয়া তুমি কি কেবল এইটুকু মাত্র শিক্ষা করিবে, যে এই সংসারে

* কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিও হইতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের চিত্র অবলোকন কর।

সমস্তই অনিত্য, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, সমস্ত বৈচিত্রপূর্ণ? এ ভিন্ন ইহা হইতে কি তুমি অন্য কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পার না? ভাই জগৎবাসী নরনারি! ভাই ভারতবাসি! সর্ব্বোপরে ভাই বঙ্গবাসি! তোমরা এত তরল বুদ্ধি হইও না। এই মহান্ চিত্র সকলে দর্শন কর, অনিমেষ নেত্রে ইহা অবলোকন কর, ইহার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ কর, ইহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা কর, চিন্তা কর, প্রথম দৃষ্টিতেই 'বেশ হইয়াছে' বলিয়া লঘু চিত্তে ইহা হইতে আপনার মন অপসৃত করিয়া লইও না, যত ইহা দর্শন করিবে, যত ইহার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে, যত আপন হৃদয়ের অস্থি মজ্জার সঙ্গে ইহাকে মিশ্রিত করিতে পারিবে, তত তোমার আত্মশুদ্ধি হইবে, তত তোমার জীবন্মুক্তির উপায় উদ্ভাবিত হইবে, তত তুমি এই জগতে মনুষ্যনামের উপযুক্ত হইতে এবং এই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের পাঠকবর্গ বোধ করি সকলেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবগত আছেন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া দিই যে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজসভায় উপস্থিত হইলে হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে যথাবিহিত প্রণাম করার পর মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিয়া দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। কি দক্ষিণা দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি বলিলেন হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত রাজ্য ধন না প্রাপ্ত হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না। গুরুদক্ষিণা দেওয়া শিষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; সুতরাং রাজ্য ধন সমস্তই যাইতেছে বুঝিয়াও হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। রাজত্ব দান করিয়া তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া পথের ভিখারী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা পূর্ণ হইল না,—তিনি আরও কিছু প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের আর কিছু নাই, অনন্যোপায়, অবশেষে কাশীতীর্থে উপস্থিত হইয়া সামান্য মূল্যে আপন মহিষী এবং শিশু পুত্রটি বিক্রয় করিলেন। বিনিময়ে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও মহর্ষির দাবী পূরণ হইল না,—তিনি আরও কিছু চাহেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র নিজে বিক্রীত হইলেন, কাশীস্থ মণিকর্ণীকা শ্মশান ঘাটের ইজারাদার এক ব্যক্তি চণ্ডাল তাঁহাকে ক্রয় করিল, এবং সেই শ্মশানে তাঁহাকে প্রহরীস্বরূপ নিযুক্ত করিল। হরিশ্চন্দ্র এখন চণ্ডালের ক্রীতদাস, শ্মশানে শবদাহের জন্য পয়সা আদায় করিয়া কাল ক্ষেপণ করেন। স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের তিনি বিক্রয় করিয়াছেন, তাহারা আর তাঁহার নাই, সুতরাং তাহারা কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা দেখিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন কিম্বা অধিকার নাই। ওদিকে তাঁহার স্ত্রী একজন বণিক, যে তাঁহাকে স্বপুত্রে ক্রয় করিয়াছিল, তাহারই বাটীতে অতি কষ্টে ক্রীত দাসী হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন প্রাণপণে পরিশ্রম করেন, দিনান্তে যে আহার পান, তাহাই রাত্রিকালে মাতা পুত্রে বণ্টন করিয়া উদরপূর্ত্তি করেন। কিন্তু এত কষ্টেও ভগবানের অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না—অবশেষে একদিন দুঃখিনীর শিশুপুত্রটি

সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পুত্রের সৎকার করিতে হইবে; যাহার বাড়ীতে আছেন, সে কৃপণ নির্ম্মম লোক, খরচ করিয়া লোকজন দিয়া সে সৎকার কার্য্যটা করাইয়া দিবে, তাহাও তাহার দ্বারা হইল না। সুতরাং দুঃখিনী অসহায়া রমণী কি করে, সমস্ত দিন প্রভুর কার্য্য করিয়া রাত্রি কালে অবসর প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং মৃত পুত্রটি ক্রোড়ে লইয়া শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে কি অবস্থায় অভাবনীয়রূপে তাঁহার স্বামী চণ্ডালরূপধারী রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল তাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন, কি কারণে হরিশ্চন্দ্রের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইল। আমরা বলি **কর্ত্তব্য পালন চেষ্টাই** সেই এক মাত্র কারণ। হরিশ্চন্দ্র রাজা ছিলেন; তিনি প্রভূত বলবীর্য্য এবং ধনৈশ্বর্য্যশালী ছিলেন, আর লোকবলেরও তাঁহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। এমন অবস্থায় বিশ্বামিত্রের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াও যদি তিনি তাঁহার অযথা দক্ষিণা দান করিতে স্বীকৃত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি ভয়ের কথা ছিল? কিছুই নহে। আর যদি তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধব অমাত্য স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কে তাঁহাকে বলিত যে একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের কথায় তিনি সমস্ত রাজ্যপাট ছাড়িয়া পথের ভিখারী হউন? কিন্তু তিনি তাহা কিছুই করিলেন না, আপনি সত্য করিয়াছেন, সেই সত্য যাহাতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হয় তাহার জন্যই তিনি প্রস্তুত হইলেন। জগতের লোক, আত্মীয় স্বজন হাহাকার করিতে লাগিল, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে বাতুল বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁহার মন কিছুতেই বিচলিত হইল না। একমাত্র সত্য এবং কর্ত্তব্যের খাতিরে তিনি স্ব ইচ্ছায়, সন্তুষ্টচিত্তে, অবলীলাক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

কর্ত্তব্য এমনি জিনিষ—কর্ত্তব্য এই-রূপেই পালন করিতে হয়। যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, রাজবাটী, সহর, সমগ্রদেশ উৎসবে পরিপূর্ণ, অভিষেকের সম্বাদ প্রচারিত হইয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, দাসানুদাসেরা আগমন করিয়াছেন, কল্য রাম রাজা হইবেন। এমন সময়ে বৈরনীর কণ্ঠে দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব হইল, হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হইল। মহিষী রাজার বড় প্রিয়পাত্রী, আজীবন রাজার অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন, রাজাকে অনেক অপরিসীম সুখে সুখী করিয়াছেন, রাজা তজ্জন্য কৃতজ্ঞ, তাঁহার নিকট সত্যবদ্ধ। কৈকেয়ী এই সমস্ত স্মরণ করিয়া এমন সময়ে রাজার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিলেন। বরটি কি? না, কল্য যে রাম রাজা হইবেন, যে রাম রাজ্যের, দেশের, সমস্ত জগতের নয়নপুত্তলীস্বরূপ, সেই বালক রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে পাঠান হউক। দশরথ যে কৈকেয়ীকে এত ভাল বাসিতেন, যাহাকে এ সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র অদেয় ছিল না, সেই কৈকেয়ীর এবম্বিধ রাক্ষসী আচরণ দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে যাতনায় সেই কৈকেয়ীকেও তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন—

'নৃসংশে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যান্ত-বিনাশিনি!'

কিন্তু যাহাই কিছু করুন, কৈকেয়ীর

নিকট তিনি সত্যবদ্ধ; রামই বনে যান আর তাঁহার নিজের প্রাণই বহির্গত হইয়া যাউক, কৈকেয়ীর যে প্রার্থনা তাহা রক্ষা করিতে হইবে,—যে রাম প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, যে রাম কাল রাজা হবে—তাহাকে জটা বল্কল পরাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইতে হইবে। সত্য রক্ষা—কর্ত্তব্য পালন ইহাকেই বলে।

আবার দেখ, রাম যেমন শুনিলেন পিতা সত্যবদ্ধ, অমনি রাজ্যপাট সুখসম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কৈশোর বয়সে বনে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। রাজ্যের লোক বিমুখ, জননী রুষ্টা, স্ত্রী শোকাকুলা, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অভিপ্রায় টলিল না। ভক্ত অনুজ লক্ষ্মণ, সাধ্বী পত্নী সীতা একদণ্ড তাঁহার অদর্শনে জীবন ধারণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন, শেষে তাঁহাদিগকে লইয়াও যাইবেন—তথাপি পিতার সত্য ভঙ্গ করিতে দিবেন না। পাঠক দেখুন, সত্য রক্ষা—কর্ত্তব্য পালন কি প্রকারে করিতে হয়?

রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবন এই মহান্ কর্ত্তব্য প্রিয়তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাল্যকালে শুনিতাম যে যে ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয়না। সে কথা বাস্তবিক—সে কথার এক কণাও ভুল নহে। এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় তৎপ্রদত্ত উপদেশ আপন জীবনে সফলীকৃত করিতে পারে, বাস্তবিকই তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না—সে স্বশরীরে স্বর্গলাভ করে!

এক্ষণে এস পাঠক, আমরা নিজ নিজ চরিত্রের ইতিহাস আলোচনা করি। স্থির-চিত্তে একবার আদ্যোপান্ত চিন্তা করি,—দেখি, কর্ত্তব্য পালনরূপ যে এই মহাকার্য্য আমরা কে কতদূর করিতে পারিয়াছি বলিয়া থাকি। আমরা সামান্য লোক, পৃথিবী মধ্যে কীটানুকীট, যেমন নরককুণ্ডে কোটী কোটী কীট একের গায়ে অপরে জড়িত হইয়া কীল কীল করিতে থাকে, আমরাও সেইরূপ এই সংসার মধ্যে কষ্টে দুঃখে, পাপে বিষাদে, অবসন্ন হইয়া এক একজন এক একটু যায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছি। আমাদের অভিপ্রায়ের স্থিরতা নাই, উদ্দেশ্যের ঠিকানা নাই, আমাদের হৃদয়ে বল নাই, মনে বীর্য্য নাই, এক খেই তুলা যেমন লক্ষ্য ভ্রান্ত হইয়া অসীম আকাশে বায়ুভরে চালিত বিচালিত হইতে থাকে, আমরাও সেইরূপ এই ঘটনাসঙ্কুল সংসার মধ্যে সেই ঘটনা কর্ত্তৃকই প্রতিমুহূর্ত্তে ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছি। বল পাঠক, বল ভাই প্রাণের দ্বার খুলিয়া, হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, বল, আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ কি না, আমরা ইহার অপেক্ষা কিছু ভাল কিনা?

কিন্তু কেন? তোমার আমার, হোরে রামশঙ্করের এরূপ শোচনীয় অবস্থা কেন? রাজা দশরথ তোমার আমার মতনই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; রামচন্দ্রও মানবের পুত্র হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, চৈতন্যও একজন নবদ্বীপস্থ গরীব ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন; ম্যাজিনিও ইতালীর একটি দরিদ্র পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার পর, আমাদের অদ্যকার আলোচ্য মহাত্মা হরিশ্চন্দ্রও মনুষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাই বা অমন

কেন হইলেন, আর আমরাই বা এমন কেন হইলাম ?

মানুষ জন্মগ্রহণ করিল, দশমাস ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃউদরে অবস্থান করিয়া পূর্ণ মানবাকারে পৃথিবী মধ্যে অবতীর্ণ হইল। প্রথমে শৈশব, তৎপরে বাল্য, তৎপরে কৈশোর, তৎপরে যৌবন ক্রমান্বয়ে সকল গুলি অবস্থাই তাহার উপস্থিত হইল। যত দিন কৈশোর কিম্বা যৌবন না উপস্থিত হইল ততদিন পর্য্যন্ত সে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের সম্পূর্ণ অধীন, যে ভাবে তাঁহারা চালাইবেন, সেই ভাবেই তাহাকে চলিতে হইবে। কিন্তু পরে যখন সে যৌবনপদবীতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার বুদ্ধির বিকাশ হইল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হইল, সে নিজে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইল। তাহার প্রকৃত জীবনারম্ভ এই সময় হইতেই হইল। এক্ষণে তাহার সম্মুখে কতক গুলিন কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিত হইল, যদি তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে সেই কার্য্যগুলি করিতে হইবে। প্রথম কর্ত্তব্য—আত্মরক্ষণ, দ্বিতীয়, পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারদিগকে প্রতিপালন করা, তৃতীয়, দেশের উপকার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক মনুষ্যই আপনাপন অবস্থানত ন্যূনাধিক পরিমাণে এই কার্য্য গুলি করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের কার্য্যের প্রক্রীয়া এক হয় না, বুদ্ধির তারতম্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন সদসৎ পথ অবলম্বন করে, এবং সেই জন্য তাহাদের কার্য্যের ফলও পৃথক পৃথক হয়। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধির মধ্যে হাজার এই তারতম্যতা থাকুক, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই কতগুলি এরূপ মহৎ কার্য্যসূত্র নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে যে তাহার মাননা অবমাননা দ্বারাই তাহার ইহজীবনে নীচত্ব কিম্বা মহত্ব লাভ হয়। "সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে এবং সত্যকার্য্য করিবে" ইহা একটি মূল সূত্র; 'পরদার গমন করিবে না' ইহা আর একটি মূলসূত্র, 'কখন জ্ঞানত পরের অনিষ্ট করিবে না ইহা একটি তৃতীয় মূলসূত্র। প্রত্যেক মনুষ্যের বিবেকের মধ্যেই এই মূলসূত্রগুলি অবস্থিতি করিতেছে, যে ব্যক্তি তাহার একটি না একটি অবলম্বন করিতে এবং অবলম্বন করিয়া তাহাকে আপন জীবনে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে ধন্য হইয়া থাকে, এবং সেই ব্যক্তিই সমস্ত জগতের চক্ষুতে মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে কর, তুমি যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, তোমার পিতা খুব ধনৈশ্বর্য্যশালী লোক ছিলেন, সুতরাং তুমি অনেক বিষয় বৈভবের উত্তরাধিকারী হইলে। কিন্তু কিছুদিন পরে এক ব্যক্তি আসিয়া তোমাকে বলিল যে তোমার পিতা তাহার নিকট কতকগুলি টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছেন। সে টাকা গুলি অনেক, তাহা পরিশোধ করিতে হইলে এমন কি তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়—তোমাকে পথের ভিখারী হইতে হয়। যে ব্যক্তি টাকা দিয়াছিল, তাহার কিন্তু কোন লেখাপড়া নাই, তাহার প্রাপ্য সে এখন কোন দলীল দস্তাবেজ দ্বারা প্রমাণ করিতে অক্ষম। এমন অবস্থায় তুমি কি করিবে ? জীবনারম্ভ করিয়াই এই ঘটনাটি ঘটিল—তোমার সম্মুখে এই বিষয়টি উপস্থিত হইল। এখন কর্ত্তব্য কি ?

তুমি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিকট সদুপদেশ প্রার্থনা করিলে। কে তোমায় বলিবে, তুমি আজ ব্যাঙ্কার ছেলে, সমস্ত বিষয় বৈভব পরিত্যাগ করিয়া কাল পথের ভিখারী হইয়া যাও? পরের কথা ছাড়িয়া দাও, তোমার আপনার স্ত্রী আপনার মাতা, আপনার ভ্রাতা ভগিনী,—তাহারা ত তোমার হস্তরোধ করিবার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইবে। তখন তুমি কি করিবে? সাধারণ জগতের সম্মুখে তুমি যদি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চাহ, আপন আত্মীয় স্বজনের নিকট যদি তুমি নিস্পৃহ নিঃস্বার্থ বলিয়া গণ্য না হইতে চাহ, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে তোমার পিতৃঋণ অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তোমার বিবেক কি বলিবে? 'কখন অসত্য কার্য্য করিও না'—বিবেকের মধ্যে সেই যে একটা মূল কথা আছে, যাহা অহর্নিশি তোমাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করে না—তাহার কি জবাব দিবে? কোন জবাব দিতে পারিবে না, জোর করিয়া গলা টিপিয়া তাহার অপঘাৎ করিবে মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে তুমি আর এ জগতে মহৎ হইতে পারিলে না,—মনুষ্য জীবন সার্থক করিবার যে একটা অভাবনীয় সুবিধা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অবহেলায় তুমি পরিত্যাগ করিলে! কিন্তু রাজা দশরথ কিম্বা রামচন্দ্র, কিম্বা চৈতন্য, কিম্বা আমাদের হরিশ্চন্দ্র তাহা কখনই করিতেন না।

তুমি আমি জগতের লোক, সহজেই বলিব—না! বেশ কথা, আমি এককথায় লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় ছাড়িয়া দিই, দিয়া ছাল পরে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই! ধর্ম্ম—ধর্ম্ম? ধর্ম্মরক্ষার—সত্য পালনের কি এই ফল, যে যেমন আমি তাহা করিলাম, অমনি আমার মস্তকে বজ্রাঘাৎ হইল, আমি অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলাম? ধর্ম্ম কর্ম্ম করা ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যতদূর 'বয় সয়' ততদূরই ভাল, তার বেশী হইলেই বোকামি হইয়া পড়ে' জগতের বুদ্ধি,—তোমার আমার মত জগতের সাধারণ লোকের বুদ্ধি ঠিক এই রূপই বটে, আর তোমার আমার বিশ্বাসও এইরূপ বুদ্ধির উপরই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এরূপ বুদ্ধি কুবুদ্ধি মাত্র,—ইহা ভয়ঙ্কর ভ্রমসঙ্কুল।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, তুমি কি চাও? অবশ্য তুমি সুখ চাও কেন না সমস্ত জগতের লোকটাই সুখের জন্য হাহাকার করিতেছে, আর তুমিও কেবল এই সুখের জন্যই মিথ্যা করিয়া তোমার পিতৃঋণ অস্বীকার করিতে উদ্যত হইতেছ। কিন্তু আমি বলি ভাই, তুমি সুখ চিনিলে না, সংসার মধ্যে প্রকৃত সুখ যে কি পদার্থ তাহা তুমি আদৌ বুঝিতে পারিলে না। ধর্ম্মে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, পরমেশ্বরে যদি তোমার ভক্তি থাকে, পরকালে যদি তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে বল দেখি, রাজা হরিশ্চন্দ্র সুখের ঠিক রাস্তা ধরিয়াছিলেন কি তুমি ঠিক রাস্তা ধরিলে? রাজা হরিশ্চন্দ্র তোমার অপেক্ষা বোকা, কি তুমি তাঁহার অপেক্ষা শত সহস্রগুণে বেশী বোকা হইলে? আমি বলি তুমিই বাস্তবিক বোকা; কেন না আজ যেন তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া কোন প্রকারে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিলে, জীবন ভরিয়া আয়াস, সুখ,

সচ্ছন্দতা—ততদূর মনুষ্যের সম্ভব তাহা ভোগ করিয়া লইলে, কিন্তু পরকালে যে নরক ভোগ ভিন্ন তোমার আর অন্য কোন গতি হইল না। ইহজীবনে সৎকার্য্য করিয়া ক্রমশঃ স্বর্গ এবং ঈশ্বরের সমীপস্থ হওয়াই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমার পক্ষে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইল না, তুমি উপরে না উঠিয়া সহস্র যোজন নিম্নে অধঃপতিত হইলে। কিন্তু দেখ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কি হইল? তিনি সত্যরক্ষা এবং কর্ত্তব্য পালন করিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; সেই প্রতিজ্ঞার জন্য কত ভয়ানক ভয়ানক সংসারিক দুঃখ তাঁহার মস্তকে পতিত হইল; রাজা হইয়া তিনি চণ্ডালের ভৃত্য হইলেন, তাঁহার স্ত্রী রাজমহিষী হইয়া পথের ভিখারিণী হইলেন, কিন্তু এই সমস্ত দুঃখের পর তাঁহার জীবনের শেষ ফল কি হইল? তাঁহারা স্বশরীরে স্বর্গারোহন করিলেন!—যে স্বশরীরে স্বর্গারোহণ, সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যার পর বড় বড় মুনিঋষি যোগী তপস্বীরও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

কিন্তু জানি, তুমি পাঠক—তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় পাঠক, তুমি হয়ত স্বর্গারোহণ কথাটা আদৌ বিশ্বাস করিবে না, অলীক এবং সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিবে। অবশ্য ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়—বড়ই অনুশোচনার বিষয়। কিন্তু যাক্, পরকালে স্বর্গারোহণ এ কথাটা না মান, ইহকালেই যে মনুষ্য স্বর্গসুখ,—সুখের তুলনায় বদর্য্য বৈষয়িকসুখ অতি, অতি অসার—ইহজীবনেই যে মানুষ সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারে, তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে? যদি না কর, তা হইলে আমার অনুরোধ, আমি পায়ে ধরি বিনয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি, তু একবার মুহূর্ত্তের জন্যও কোন প্রকৃত স মহৎ ব্যক্তির সৎসঙ্গ করিও, তাহা হই তুমি দেখিতে পাইবে, যে সামান্য কৌপি ধারণ করিয়াও, ভিক্ষার অন্ন ভোজন কর যাও, কাষ্ঠ কমণ্ডলুতে জলপান করিয়া সেই মহাত্মা অহরহ যে অপার অসী বিমলানন্দ ভোগ করেন, তাহার সামা আভাষমাত্রও তুমি কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার লক্ষ লক্ষ টাকার স্তূপেতে বসি য়াও—মনে ধারণা করিতে পার না। কি তাঁহাদের এই চমৎকার অবস্থা কি করিয উপস্থিত হয়? আর কিছুই নহে, কেবল মাত্র সত্য এবং কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা তাঁহারা জীবনারম্ভেই এইরূপ কোন একট মূলমন্ত্র অবলম্বন করেন, সুখ দুঃখ যাহাই হউক, তাহাকে কিছুতেই পরিত্যা করেন না। তাহাতেই তাঁহাদের হৃদ শুদ্ধ হইয়া যায়, তাঁহাদের পথ পরিষ্কৃ হইয়া যায়, তাঁহারা পরম সুখে এবং স্বচ্ছন্দে জীবনে অগ্রসর হইতে থাকেন।

সাহিত্য সমাচ

সাময়িক পত্র।

ফাল্গুন।

আমরা ফাল্গুন মাসের নিম্নলিখিত সাম-
ক পত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।—আলোচনা,
ব্ধব, প্রচার, নবজীবন, ভারতী, রামধনু,
সঙ্গ (পৌষ ও মাঘ একত্রে), নব্যভারত,
র্য্যদর্শন (ফাল্গুন ও চৈত্র একত্রে) এবং
াকা (ফাল্গুনের ৪ সংখ্যা)।

সমস্ত পত্রগুলি মোট প্রবন্ধ সংখ্যা ৭৪,
ধ্যে—

রাজনীতি	..	৫
হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্ম	..	১২
ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব	.	৮
সমাজনীতি	..	১০
জীবনচরিত	.	২
কাব্য ও নবন্যাস	..	৪
দর্শন	.	৫
বিজ্ঞানশিল্প ও বাণিজ্য	...	৬
বিবিধ	...	৮
পুস্তকাদির সমালোচন	...	৩
পদ্য	...	১১
মোট		৭৪

উপরোক্ত মোট প্রবন্ধ সংখ্যা হইতে
র্ব্বনিম্নকথিত তিনটি বিষয় (যাহা বিশেষ
য়োজনীয় নহে) ছাড়িয়া দিলে মোট
াঠোপযোগী প্রবন্ধ সংখ্যা ৫২টি হয়;
ধ্যে 'হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র এবং ইতিহাস ও
পুরাতত্ত্ব' ৫
২০টি, অর্থাৎ
য়াংশেরও ৫
প্রবন্ধ কেবল ৪

পূর্ব্বেও আ
করিয়াছি, এবারে
সাময়িক পত্র স
বহুল এবং প্রয়ো
না। ভারতবর্ষের পু
এবং ইহার পুরাতত্ত্ব
আমাদের শিক্ষিত স
ঝোঁক হইয়াছে, কি
চনার কার্য্যটা তাঁহারা একেবারেই স
হিক বিশ্বা দৈনিক সম্বাদপত্রের লে
দিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভার
বর্ষের পুরাতন শাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি ত
গত হওয়া আমাদের পক্ষে অতীব প্রে
জনীয়, এবং আমরা জানি সাময়িক পত্র
এই সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হই
বার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ উপায়। আমাদের
বিশ্বাস এই যে যত ইহার সমধিক আলো
চনা হইবে, আমাদের অভিজ্ঞতা তত বৃদ্ধি
হইতে থাকিবে এবং তত আমরা আমা
ভবিষ্যৎ জাতীয়জীবন গঠনোপযোগী স
'মাল মসলা' সংগ্রহ করিতে
কিন্তু পুরাতত্ত্বের জ্ঞা
পক্ষে।

ধরিতে হইল। এরূপ আলোচনাতে প্রত্যে
ঘটনার বিস্তারিত সম্বাদ ঘোষণা হইতে
পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের সাধা
মত উত্তমরূপে সৃষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে
পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে ক
সে দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্য
সম্বন্ধীয় বজেট প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে
কোন সম্বাদ পত্র না এই বিষয়ের সম্বা
প্রকাশ করিয়াছেন? কিন্তু বজেট জিনিষ
কি, ইহাতে 'সর্প মণ্ডুক' কি আছে, তা
আমরা কয়জন লোক অবগত আছি
অনেকে এই মাত্রই বুঝি যে বজেটটা আ
ব্যয়ের হিসাব মাত্র, কিন্তু এই আয় ব্যয়ে
হিসাবটাই যে রাজত্বের সর্ব্বোচ্চ প্রয়ো
জনীয় জিনিষ তাহা আমরা কয়জনে বুঝি
কিন্তু কথা এই যে আমাদের বুঝিবারং
যো নাই, সুধু সম্বাদপত্র পাঠে তাহা হইতে
পারে না। সাময়িক পত্রে বিস্তৃতভাবে
চিন্তাশীলতা, গবেষণা, এবং অনুসন্ধানের
সহিত যতক্ষণ ইহা আলোচিত না হইবে
ততক্ষণ এতৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ অভি-
জ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। আর মনে কর
যতদিন না সেই পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদের
হইবে, ততদিন কি আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে
আমাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব?
কখনই না। উপর২ হো! হো! করিলে
জাতীয় উন্নতি হয় না। ভরসা করি, আমা
দের সাময়িকপত্রের সম্পাদকগণ এই বিষয়টা
উপর ক্রমশঃ একটু মনোযোগ করিবেন।

আমাদের বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের
আর একটি মহৎ অভাব এই যে ইহাতে
ইতিহাস কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র কিম্বা বর্ণনবিজ্ঞান
সম্বন্ধে কখন কখন যাহা দুই একটা প্রবন্ধ
প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখকগণের গবেষ

ায়
ধা
র্য্য-
হইতে
দিগের
করিতে
দ্ধ সামা-
বা আসল
তাহা সর্ব্ব-

তার হিসাবে
ময়িক সাহিত্য
চিত, আমাদের
হয় নাই। ২৫।৩০
ইয়াছে, সময়ের
বিবেচনা করিলে,
ব সুখী এবং সন্তুষ্ট
পস্তাবে এ বিষয়ে
রা এখনও অনেক নিম্নে পড়িয়া
ছি। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে যে
রনীতি অন্যান্য দেশের সাময়িক সাহি-
ার একটি প্রধান অঙ্গ, আমরা এ পর্য্যন্ত
া আদৌ গ্রহণ করিতে পারি নাই।
াদের সম্বাদপত্রে আজ কাল রাজনীতির
্যক আলোচনা হইতেছে বটে; কিন্তু
ম্বাদপত্র কেবলমাত্র সম্বাদ পত্রই; তাহাতে
তি সপ্তাহের মধ্যে যাহা কিছু ঘটে,
হার কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং
বরণ থাকা সম্ভব। একটা বিষয় অদ্য
খিত হইল; তৎসম্বন্ধে লেখকের পূর্ণমত
ং অভিজ্ঞতা পত্রের একটি কিম্বা দুইটি
— হইতে পাইল না, এমন
— ঘটনা উপস্থিত;
— মটি

া কিম্বা অনুসন্ধান কমই লক্ষিত হয়।
ব বসিয়া আপন মস্তিষ্ক বিলোড়নের
া যতদূর সম্ভব ততদূর আমাদের দ্বারা
শ লেখা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার
গে অগ্রসর হইতে আর আমরা প্রস্তুত
ইনা। এটি আমাদের জাতীয় দোষ, এই
োষ অপনীত না হইলে আমাদের জাতীয়
াহিত্যের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

এবারকার "আলোচনা" র প্রবন্ধগুলি
দিও ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার অধিকাংশই
গাশীলতা এবং উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।
ালোচনা পত্রিকাখানি যে অতি যোগ্য
ার সহিত সম্পাদিত হইতেছে তাহাতে
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

এবারকার বান্ধবে 'ধূমকেতু' এবং 'আর্য্য
ত্রিকা" নামে দুইটি অতি উচ্চদরের
বন্ধ আছে। মনোযোগ পূর্ব্বক এই দুইটি
বন্ধ অধ্যয়ন করিলে পাঠকেরা অনেক
ান লাভ করিতে পারিবেন। 'মহারাণীর
াতীর উপাখ্যান' বলিয়া ইহাতে আর
একটি প্রবন্ধ আছে। ইহার অভিপ্রায়
কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কৌতুক এবং
দ্রূপ করিয়া সমাজসংস্কার করা যদি লেখ-
কর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি
াহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা তদ্বি-
য়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

"প্রচার" বাস্তবিকই প্রচার—হিন্দুধর্ম্ম
চারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বঙ্কীম
াবুর সুযোগ্য লেখনী যখন ইহাতে অহ-
হ নিযুক্ত, তখন ইহা যে ভাল হইবে
াহাতে সন্দেহ কি? ইহাতে এবার
খ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর
ালবাসা" নামে একটি অতি উৎকৃষ্ট
ন্ধ আছে।

বারে
'ভারে
'আমা
চারিটী
হইয়াছি।
পূর্ণ, তেম
পন্যাটীও অ
হইয়াছে।' কি
আমাদের একেবা
এই প্রবন্ধের লেখ
দিগকে ভাল গল্প শু
য়ের উপর শ্লেষ কর
নহে, বোধ করি ত্রা
করাই লেখকের প্রধা
আমরা বলি, তাহা হইলে 'নবজী
প্রকাশিত হওয়া উচিত হয় নাই।

'বামধনু'—নবম বিজ্ঞান পত্র। এই
পত্রিকাখানিতে শিল্প এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধী
অনেক বিষয় সহজ ভাবে এবং ভাষা
লিখিত হইয়া থাকে। বঙ্গবাসীমাত্রেরই
এই পত্রিকাখানিকে উৎসাহদান করা
কর্ত্তব্য।

'নব্যভারত।' ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধ
গুলিই সুপাঠ্য। 'তৃষার প্রবাহ' প্রবন্ধে
একটি অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ব্যাপার বর্ণিত
হইয়াছে। 'সিংহল যাত্রা' প্রতিবাদটি
অতি উত্তম এবং সময়োপযোগী হইয়াছে।
'নবজীবনের' লেখক মহাশয় কি বলিয়া
এই প্রতিবাদ খণ্ডন করেন তাহা শুনিবা-
জন্য আমরা ব্যগ্র রহিলাম।

'সৎসঙ্গ।' এই ক্ষুদ্র পত্রি-
উত্তমরূপে

ছেন। যাহা হউক তাঁহার প্রবন্ধ শেষ না হইলে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না।

'পতাকা'—একখানি উচ্চদরের সাপ্তাহিক-সম্বাদ এবং সাময়িক পত্র। আমরা ইহার আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি, ইহার সম্পাদন কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্বাদ এবং তাহার উপর সম্পাদকের অভিমত বিস্তারিতরূপে ইহাতে প্রকাশিত হয় তদ্ভিন্ন সাময়িক পত্রের উপযোগী সাধারণ ভাবের বিস্তৃত প্রবন্ধও লিখিত হইয়া থাকে।

পীযূষ প্রবাহ—এখানি হিন্দী মাসিক পত্রিকা, পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস ইহার সম্পাদক। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানিতে অনেক গুলিন ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় ও ইহার সম্পাদন কার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সাধারণ হিতকর সাময়িক পত্রের উপযোগী বিষয় সকল ইহাতে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, কারণ এতদ্দেশে ঐরূপ পত্রের নিতান্ত অভাব। আমরা আশা করি পণ্ডিতবর ঐ অভাব দূর করিয়া পত্রিকাখানির যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

PRINTED AND PUBLISHED BY NERODE CHUNDER MOOKERJEE AT THE
BAPTIST PATRIOT PRINTING CO'S. "UNION PRESS."